বাঙলার গাছপালা

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-১

ভূমিকা

প্রয়াত বিজ্ঞান সাধক ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণের উপযোগী বহু প্রবন্ধ বাংলায় লিখেছেন। দুঃখের বিষয়—কিছু বাদে সে সব অধিকাংশ রচনার সঙ্কলন এযাবৎ প্রকাশিত হয়নি। এখানে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্ভিদ বিষয়ক রচনার নির্বাচিত সঙ্কলন প্রকাশিত হলো। প্রবন্ধের শেষে কোথায় এবং কবে তা প্রকাশিত হয়েছে তা দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনবোধে কোন কোন প্রবন্ধের অল্প-বিস্তর সম্পাদনাও করা হয়েছে। আমাদের আশা—পুস্তকটি সকলেরই আনন্দ ও জ্ঞানার্জনের সহায়ক হবে।

পুস্তকটি প্রকাশে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, জয়কৃষ্ণ পাব্লিক লাইব্রেরী (উত্তরপাড়া), ফটো ম্যানসন (উল্টাডাঙ্গা) শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ভাবে সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

সূচীপত্র

উদ্ভিদের রাহাজানি। নেপেনথেস বা ঘটিলতার পোকামাকড় ধরবার চেষ্টা।

মশক দমনে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব। ইউট্রিকুলেরিয়ার প্রত্যেক গ্রন্থিতে দুটি করে ফাঁদ।

লাফানো মটর।

উদ্ভিদের রাহাজানি

মনুষ্য সমাজে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রভৃতি নীতিবিগর্হিত ব্যাপারগুলির অতিমাত্রায় আধিক্য লক্ষিত হলেও জীবিকানির্বাহের পথ অধিকতর সুগম করবার নিমিত্ত জীবজগতের প্রায় সর্বত্রই অল্পাধিক গর্হিত উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। অবশ্য মনুষ্য সমাজের ন্যায়নীতি মনুষ্য কর্তৃক রচিত কৃত্রিম বিধান মাত্র—স্বাভাবিক নিয়ম নয় এবং মনুষ্যেতর জীবজগৎও এই নিয়মে পরিচালিত হয় না, তথাপি মনুষ্য সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই তাদের কার্যপ্রণালীর বিষয় আলোচনা করব।

প্রকাশ্য ক্ষেত্রে দৈহিক সামর্থ্য বা বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী। কিন্তু গোপনীয়তা বা চাতুরী অবলম্বিত হলে সে স্থলে বাহুবল পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য। এই কারণেই অসীম শক্তিশালী হয়েও সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরাও অনেক সময় গোপনীয়তা অর্থাৎ চুরি, বাটপাড়ির মত হীনবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। বিড়াল অর্ধভুক্ত ইঁদুর নিয়ে বসে আছে। কয়েকটা কাক এসে চতুর্দিক থেকে তাকে উত্যক্ত করে তুলল। দুই-তিনটা কাক তার সম্মুখের দিক থেকে মাংস খণ্ড ছিনিয়ে নেবার ভান করতে লাগল; ইতিমধ্যে পিছন থেকে একটা কাক তার লেজে ঠোকর মারল। রাগান্বিত হয়ে বিড়াল তাকে তাড়া করা মাত্রই সম্মুখের একটা কাক সেই মাংসখণ্ড নিয়ে উধাও হল। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই নজরে পড়েছে। কাক তার বাসায় বসে ডিমে তা দিচ্ছে—কোথা থেকে একটা কোকিল উড়ে এসে কুক্-কুক্-কিক্-কিক্ করে ডেকে উঠল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলে কাকেরা তাকে তাড়া করল। কোকিলও পলায়নের ভান করে তাদিগকে বাসা থেকে বহুদূরে নিয়ে গেল। স্ত্রী-কোকিল নিকটেই কোথাও ডালপালার আড়ালে আত্মগোপন করে বসেছিল;—সুযোগ বুঝে সে কাকের বাসায় উপস্থিত হল এবং তার ডিম নষ্ট বা উদরস্থ করে সে স্থলে নিজের ডিম পেড়ে রাখল। কাকের বাসা নির্মিত হবার পর এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। ডালে বসে নিরিবিলি খাবে বলে চিল একটা মাছ শিকার করে নিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ কোথা থেকে আর একটা চিল উড়ে এসে তার শিকার ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হল। যে ছিনিয়ে নিল তারই যে তা ভোগে আসবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই। হয়ত অন্য একটা চিল আবার তার উপর বাটপাড়ি করবে। চিংড়ী, কই, খলসে, চেলা, পুঁটি প্রভৃতি যে সকল মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে বিচরণ করে তাদের মধ্যে সর্বদাই একের মুখের গ্রাস অপরকে কেড়ে খেতে দেখা যায়। বানর, শিয়াল প্রভৃতি প্রাণীদের চৌর্যবৃত্তি সম্বন্ধে

অল্পাধিক অনেকেই পরিচিত। সাপেরা প্রধানতঃ পাখীর ডিম চুরি করেই জীবিকা নির্বাহ করে। গো-সাপেরা আবার সাপের ডিম চুরি করে খায়।

নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেও চৌর্যবৃত্তি বা রাহাজানির কিছুমাত্র অভাব লক্ষিত হয় না। বিশেষভাবে মৌমাছি, ভীমরুল, বোল্‌তা, পিপীলিকা প্রভৃতি সমাজবদ্ধ কীটপতঙ্গের মধ্যে চুরি, ডাকাতি ও লুঠতরাজ প্রায় অহরহই ঘটে থাকে। আমাদের দেশীয় ক্ষুদ্রকায় এক জাতীয় ঘরো-মাকড়সার বাচ্চা প্রধানতঃ চুরি বা রাহাজানি করেই জীবিকা নির্বাহ করে। পিঁপড়েদের লাইনের ধারে এদেরকে চুপ করে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। লাইনের ধারে কোন পিঁপড়েকে ডিম অথবা খাবার টুকরো মুখে করে আসতে দেখলেই চক্ষের নিমেষে মাকড়সা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ডিম অথবা খাদ্যকণিকা কেড়ে নিয়ে বিদ্যুৎ বেগে ছুটে পলায়ন করে। কারণ, ধরা পড়লে তার মৃত্যু অনিবার্য। লুণ্ঠিত বস্তু গলাধঃকরণ করবার পর পুনরায় লাইনের ধারে নূতন শিকারের আশায় অপেক্ষা করে। আমাদের দেশে কালো রঙের ছোট ছোট একজাতীয় বিষ-পিঁপড়ে দেখতে পাওয়া যায়। পিঁপড়েগুলিকে দেখতে অনেকটা সুড়সুড়ে পিঁপড়ের মত। কিন্তু এক এক দলে সাধারণত সত্তর আশীটার বেশী পিঁপড়ে দেখা যায় না। সর্বদাই এরা একটার পিছনে আর একটা —এরূপভাবে লাইন করে চলে। একেই কাঁড়িয়া-জাঙ্গাল বলে। একদিন দেখলাম অসংখ্য সুড়সুড়ে পিঁপড়ে লম্বা লাইন করে এক গর্ত থেকে অপর গর্ত তাদের ডিম স্থানান্তরিত করছে। হঠাৎ কোথা থেকে এই বিষ পিঁপড়েদের প্রায় হাতখানেক লম্বা একটা লাইন সেস্থানে উপস্থিত হল। তারা সুড়সুড়ে-পিঁপড়েদের লাইনের কাছে আসামাত্রই চক্ষের নিমেষে উভয় লাইনই বিশৃঙ্খল হয়ে গেল। কাঁড়িয়া-জাঙ্গালের পিঁপড়েরা ইতস্তত ছুটাছুটি করে সুড়সুড়েদের যাকে পাচ্ছে কেটে দুই খণ্ড করে ফেলছে নতুবা বিষ-প্রয়োগে অসাড় করে দিচ্ছে। মিনিট দুইয়ের মধ্যেই জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে গেল—সুড়সুড়েরা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে। কাঁড়িয়া-জাঙ্গালের পিঁপড়েরা লুণ্ঠিত ডিম নিয়ে পুনরায় লাইন করে চলে গেল। নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে রাহাজানি বা লুঠতরাজের এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও জীব-জগতে 'প্যারাসিটিজ্‌ম্' বা পরোপজীবিত্ব নামে এক প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাওয়া যায়, যা সাধারণ চুরি, ডাকাতি অপেক্ষাও মারাত্মক। জীব জগতে বিভিন্ন রকমের পরোপজীবিত্বের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়—এ স্থলে ধীরে-ধীরে জীবনী-শক্তি ক্ষয়কারী পরোপজীবিত্বের কথাই বলছি। 'র‍্যামোরা' পরিবারভুক্ত লাউস-মাছ এবং ল্যাম্প্রে, স্যাজিটা প্রভৃতি প্রাণীরা অন্যান্য মাছের গায়ে ঝুলানোভাবে আটকে থেকে তাদের রসরক্ত শুষে খায়। ল্যাম্প্রের স্বজাতি হ্যাগ্‌-ফিস নামক মাছেরা অপর মাছের শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কেবল হাড় কয়খানা বাদে তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলে। আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলে এরূপ অনেক মাছ ধরা পড়ে, হ্যাগ-ফিশের আক্রমণ যাদের শরীরের উপরকার চামড়া ও ভিতরের হাড় কয়খানা মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

আমাদের দেশীয় কয়েক জাতীয় শুঁয়োপোকাও বিভিন্ন জাতীয় কুমোরপোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কুমোরপোকারা শুঁয়োপোকার শরীরে হুল ফুটিয়ে দেহাভ্যন্তরে এবং কোন কোন মাকড়সার শরীরের উপরে ডিম পেড়ে যায়। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে তারা শুঁয়োপোকার শরীরের মাংস কুরে খায়, তারপর চামড়া ফুঁড়ে বহির্গত হয়। তার কিছুকাল পরেই শুঁয়োপোকার মৃত্যু ঘটে। কিন্তু কুমোরপোকার বাচ্চা সম্পূর্ণ সুস্থ সবল মাকড়সাকে ক্রমশ নিঃশেষে খেয়ে ফেলে। এই সকল ব্যাপার ছাড়াও ব্যাক্টেরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতির পরপজীবিত্বের ফল যে কিরূপ ভয়াবহ তা কারও অবিদিত নয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও উভয়ে জীব-জগতেরই অন্তর্ভুক্ত। উভয়কে একই প্রকার জীবন-সংগ্রামের পথে অগ্রসর হতে হয়। কাজেই, উদ্ভিদ-জগতের মধ্যে প্রাণি-জগতের অনুরূপ চুরি, ডাকাতি, ছল-চাতুরীর অস্তিত্ব আছে কিনা—একথা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়। প্রাণি-জগতের প্রত্যেকেই, কম হউক বেশী হউক, তাদের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির বশেই কাজ করে থাকে। কাজেই তাদের ছল-চাতুরীর কথা অদ্ভুত মনে হলেও অসম্ভব মনে হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ-জগৎ সম্বন্ধে এ কথা খাটে না ; কারণ তাদের আকৃতি এবং প্রকৃতি দেখে সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায় যে, চুরি, বাটপাড়ি বা ছল-চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং প্রয়োজনও নাই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত। জীবন-সংগ্রামে জয়ী হবার জন্য এবং পৃথিবীর সর্বত্র অধিকার বিস্তারের নিমিত্ত এরা যে সকল চাতুর্যপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে—বিশেষ ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে তা দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। সাধারণ উদ্ভিদেরা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যোপকরণ এবং পর্যাপ্ত আলো, বাতাস সংগ্রহের নিমিত্ত সর্বদাই প্রতিবেশী উদ্ভিদদিগকে বঞ্চিত করবার নীতি অবলম্বন করে থাকে। কতক-গুলি উদ্ভিদ কেবল জল, বায়ু ও মৃত্তিকা থেকে খাদ্য আহরণ করেই সন্তুষ্ট থাকে না ; তারা কীট-পতঙ্গ এমন কি ছোট ছোট পাখী, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে পর্যন্ত অদ্ভুত কৌশলে ফাঁদে আটকে ধীরে ধীরে তাদের রক্তমাংস শোষণ করে নেয়। ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদেরা সোজাসুজি জল, বায়ু, মৃত্তিকা থেকে তাদের দেহ পোষণো-পযোগী খাদ্যবস্তু উৎপাদন করতে পারে না। কাজেই জীবনধারণের জন্য তাদেরকে মৃত উদ্ভিদ-দেহের উপরেই নির্ভর করতে হয়। কতকগুলি ছত্রাক আবার অদ্ভুত কৌশলে জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে এবং তাদের রস-রক্ত শোষণ করেই পরিপুষ্টি লাভ করে। কোন কোন জাতীয় উদ্ভিদ অপরাপর জীবন্ত বৃক্ষের রস শোষণ করে বেঁচে থাকে। কেউ কেউ আবার অন্যান্য জীবন্ত উদ্ভিদের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে কালক্রমে আশ্রয়দাতাকেই বেমালুম নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। আত্মবিস্তার অথবা আত্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উদ্ভিদ কর্তৃক যে-সকল কৌশল অবলম্বিত হয়ে থাকে, জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকবার পক্ষে অপরিহার্য হলেও তা চুরি, ডাকাতি বা

রাহাজানির পর্যায়ভুক্ত এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য পরোপজীবী উদ্ভিদেরাই এই সকল গর্হিত উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।

লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতি নিরীহ প্রকৃতির উদ্ভিদের কতকগুলি বীজ অল্পপরিসর স্থানে একত্র বপন করলে দেখা যাবে—চারা বের হবার পর তাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হয়ে গেছে। অবাধে প্রচুর আলো পাবার জন্য কিরূপ দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেয়ে তারা একে অন্যের মাথার উপর দিয়া পাতা ছড়িয়ে দেয় তা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবে। এই প্রতিযোগিতার ফলে গাছগুলির প্রত্যেকেই কম-বেশী অস্বাভাবিক রূপে লম্বা হয়ে উঠে। কিন্তু দু-চারটি ছাড়া বাকী সবগুলিরই এই দ্বন্দ্বে পরাজয় ঘটে। বিজেতারা পাতার পর পাতা ছড়িয়ে পরাজিত গাছগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আড়াল করে ফেলে। আলোর অভাবে ক্রমশঃ নিস্তেজ হতে হতে অবশেষে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। দুর্বলের উপর সবলের এই নিষ্ঠুর পীড়ননীতি জীব-জগতের সর্বত্র সমানভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আলাদা আলাদা ভাবে এক-একটি বীজ পুঁতলে এরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ ঘটে না। ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদেরা মৃত বা পচনশীল উদ্ভিদ পেলেই তার উপর দলে দলে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। জীবিত উদ্ভিদগাত্রে কোন কারণে ক্ষত উৎপন্ন হলে অথবা পচ ধরলে সেই স্থানে ছত্রাক অথবা অন্যান্য পরগাছা জন্মে তাকে ধীরে ধীরে অন্তঃসারশূন্য করে ফেলবার চেষ্টা করে। উদ্ভিদেরাও যেন সেই ভয়েই স্ফীতি উৎপাদন করে অথবা নূতন চামড়া গজিয়ে তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থান আবৃত করে দেয়। সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও কিন্তু তারা অনেক ক্ষেত্রেই এই সকল দুধর্ষ ও পরোপজীবী শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে থাকে। 'কর্ডিসেপস' শ্রেণীভুক্ত কয়েক প্রকারের ছত্রাক আবার এমনই দুর্ধর্ষ যে, তারা জীবন্ত প্রাণীদিগকে কৌশলে আক্রমণ করে তাদের রক্তরসেই শরীর পোষণ করবার ব্যবস্থা করে নেয়। তাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাধারগুলি শুঁয়োপোকা অথবা কোন কোন জাতীয় পুত্তলির গায়ে পড়ে অঙ্কুরিত হয় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য সূত্র বের করে ধীরে ধীরে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ছত্রাক সূত্রের দ্বারা আক্রান্ত হলেই পোকাগুলি মৃত্তিকাভ্যন্তরে আত্মগোপন করে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই সূত্র কর্তৃক পোকাটার শরীরের অভ্যন্তরস্থ যাবতীয় পদার্থ নিঃশোষিত হবার পর ঘাসের ডগা বা হরিণের শৃঙ্গের আকৃতিবিশিষ্ট ছত্রাক মাটি ফুঁড়ে বাইরে আত্মপ্রকাশ করে। পোকাটার বহিরাবরণ কিন্তু সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। কিছুকাল পূর্বে রংপুর, আসাম এবং ভুলুয়া থেকে বিভিন্ন রকমের এরূপ অদ্ভুত কয়েকটি পোকা আমার নিকট পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয়েছিল। দেখে মনে হয় যেন শুয়োপোকা বা পুত্তলির আকৃতিবিশিষ্ট কোন বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম হয়েছে।

প্রাণীদের মত উদ্ভিদেরও খাদ্যসমস্যা জটিলতা বর্জিত নয়। দেহপুষ্টির জন্য তাদিগকে 'পটাস', 'নাইট্রোজেন' প্রভৃতি নানা জাতীয় উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। সকল অবস্থায় সকল স্থানে প্রয়োজনানুরূপ উপাদান সংগ্রহ করা দুষ্কর।

ভাল জমিতে অবশ্য উদ্ভিদের দেহপুষ্টির উপযোগী এই সকল পদার্থই যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকে ; কিন্তু অনুর্বর ভূখণ্ডে, জলাভূমিতে বা অন্যান্য অসুবিধা-জনক স্থানে অনেক জিনিসের অভাব ঘটতে দেখা যায়। এই সকল অসুবিধায় পড়ে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ খাদ্য-সংগ্রহের অভিনব উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। তারা কীট-পতঙ্গ এমন কি ছোট ছোট পাখী, ইঁদুর প্রভৃতি ধরে খাবার জন্য শরীরের অংশবিশেষকে অদ্ভুত অদ্ভুত ফাঁদে পরিবর্তিত করে নিয়েছে। এই সমস্ত প্রাণীর গলিত শবদেহ থেকে উদ্ভিদেরা তাদের আহারোপযোগী অধিকাংশ পদার্থই নিজেদের দেহের মধ্যে শোষণ করে নেয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শিকার ফাঁদে পড়বার কয়েক দিন পরেই গাছগুলি যেন হঠাৎ তরতর করে বৃদ্ধি পেতে থাকে। উদ্ভিদের এই শিকার ধরবার কৌশল অতি অদ্ভুত। কীট-পতঙ্গভুক বিভিন্ন জাতীয় প্রত্যেকটি উদ্ভিদই, কেউ বর্ণচ্ছটায়, কেউ সুমিষ্ট মধুভাণ্ডে, কেউ বা সাজসজ্জায় এমন ভাবে সুসজ্জিত যে, কীট-পতঙ্গেরা সহজেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। একবার ফাঁদের উপর গিয়ে বসলে আর রক্ষা নাই। ফাঁদ থেকে অনেকেই আর বের হয়ে আসতে পারে না। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের কীট-পতঙ্গভুক তরুলতা জন্মে থাকে। এদের মধ্যে 'নেপেনথেস' বা ঘটি-লতা নামক শিকারী গাছগুলিকে প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। এদের পাতার ডগা থেকে বহির্গত লম্বা বোঁটার অগ্রভাগে বড় বড় ঘটির মত একদিকে ঈষৎ বাঁকানো একপ্রকার পাত্র জন্মে থাকে। ঘটির মুখের উপর ঢাক্‌নার ন্যায় একটা পাতা ঠিক বাক্সের ডালার মত যেন কব্জার সাহায্যে উঠানামা করতে পারে। ঘটি-লতা গাছ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত। কারও পাতা আনারস পাতার মত লম্বা, কারও পাতা গোল, কারও ঘটি বড়, কারও বা ছোট। কেউ সাধারণ উদ্ভিদের মত মাটিতে জন্মে থাকে, কেউবা আবার পরোপজীবী—বড় বড় বৃক্ষকাণ্ডে জন্মগ্রহণ করে। কতকগুলি, ঘটিলতার পাতার আকৃতি ঠিক শিঙ্গার মত। এরা 'হাণ্টসম্যান-হর্ন' বা শিকারীর শিঙ্গা নামে পরিচিত। ঘটির মধ্যে এবং ঢাকনার গায়ে মধু উৎপাদনকারী কতকগুলি গ্রন্থি আছে। মধুলোভে কীট-পতঙ্গেরা এদের নিকট উপস্থিত হয় এবং মধু খেতে খেতে ঘটির ভিতরে প্রবেশ করে। ঘটির ভিতরে গলায় চতুর্দিকে নিম্নমুখ কতকগুলি সূচ্যগ্র শুঁয়ার জন্য আর বের হতে পারে না। এদিকে মুখের ঢাক্‌নাটিও বন্ধ হয়ে যায়। আবদ্ধ কীট-পতঙ্গ অবশেষে ঘটির অভ্যন্তরস্থ জারক-রসে ডুবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

উত্তর-আমেরিকার জলাভূমিতে 'সায়াসেনিয়া' নামক একজাতীয় শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের বিচিত্র বর্ণে আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে কীট-পতঙ্গ এসে ভীড় জমাতে থাকে। তার পর মধু খেতে খেতে ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ করে আর বের হতে পারে না। কালিফোর্ণিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 'ডার্লিংটনিয়া' নামক ঠিক সাপের ফণার মত এক প্রকার শিকারী উদ্ভিদ জন্মে থাকে। এরাও ফাঁদের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণ মশা মাছি ধরে তাদের রস শোষণ করে খায়। ঘটির মত

শিকার ধরবার ফাঁদ ছাড়াও কতকগুলি উদ্ভিদ ভিন্ন উপায়ে শিকার ধরবার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। 'সান-ডিউ' বা সূর্যশিশির, 'ভেনাস-ফ্লাই-ট্র্যাপ' প্রভৃতি গাছের গোড়ার দিকে কতকগুলি পাতা বের হয়। 'ফ্লাই-ট্র্যাপে'র পাতার ডগায় উন্মুক্ত মানিব্যাগের মত একটা যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের চতুর্দিকে কতকগুলি ধারালো কাঁটা সজ্জিত। খুলে থাকবার সময় কীট-পতঙ্গেরা ভিতরের লাল রঙে আকৃষ্ট হয়ে এর উপর উপবেশন করামাত্র ফাঁদটি মানিব্যাগের মত বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাপারটা ঠিক যেন ইঁদুরধরা চাপাকলের মত। কীট-পতঙ্গগুলি হজম হয়ে গেলে চাপাকলটা আবার নূতন শিকারের প্রতীক্ষায় হাঁ করে থাকে। সূর্যশিশিরের গোলাকার পত্রগুলির চতুর্দিকে এবং ভিতরে অনেকগুলি বড় বড় শুঁয়া দেখতে পাওয়া যায়। এই শুঁয়াগুলির প্রান্তভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার পদার্থ থেকে এক প্রকার আঠালো রস নির্গত হয়। এর উপর পোকামাকড় বসামাত্রই আঠা জড়াতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে শুঁয়াগুলি মুড়ে শিকারকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করে ফেলে। শিকার হজম হয়ে গেলে শুঁয়াগুলি আবার ধীরে ধীরে মেলে নূতন শিকারের প্রতীক্ষা করতে থাকে। আমাদের দেশীয় সূর্য-শিশির, জল-ঢেপা, ঘটি-লতা প্রভৃতির এরূপ রাহাজানির ব্যাপারগুলি হয়ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করেছে।

পরভোজী না হলেও বহুবিধ লতানে-উদ্ভিদ বড় বড় গাছকে অশেষবিধ লাঞ্ছনা দিয়ে থাকে। এমন কি লতার আক্রমণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উদ্ভিদকে অনেক সময় অকালে উদ্ভিদলীলা সংবরণ করতে হয়। গুলঞ্চ, মাধবী, ঢোল-কলমী, মধুকলি, গেঁদাল, খাম-আলু, তরুকলা প্রভৃতি লতাগাছগুলি শৈশবাবস্থায় যখন আম, জাম, সুপারি, নারিকেল গাছের কাণ্ড অবলম্বন করে উপরে উঠতে থাকে তখন তাদিগকে নেহাৎ নিরীহ প্রকৃতির উদ্ভিদ বলে মনে হয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তারা একেবারে মাথায় চড়ে বসে এবং অসংখ্য ডালপালা বিস্তার করে আশ্রয়দাতাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে। মেহেদী, রঙ্গন এবং অন্যান্য মাঝারি গোছের গাছের উপর পত্রশূন্য হলুদ বর্ণের এক জাতীয় সরু লতা প্রচুর পরিমাণে জন্মাতে দেখা যায়। এরা সাধারণত আলোক-লতা বা স্বর্ণলতা বলে পরিচিত। এরা সম্পূর্ণরূপে পরোপজীবী; অন্যান্য গাছের ডাঁটা বা পাতার রস শোষণ করেই জীবনধারণ করে। মাটি থেকে কোন রকমেই খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না। লতার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে অন্য গাছের উপর ফেলে রাখলে দেখা যায়, দু'এক দিনের মধ্যেই সে পাতা বা ডাঁটার গায়ে পাক খেয়ে জড়িয়ে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার শোষণযন্ত্রও বের করে দিয়েছে। অল্প দিনের মধ্যেই এরা অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে আশ্রয়দাতাকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে। দেখে মনে হয়, কে যেন মোটা মোটা স্বর্ণসূত্র স্তূপাকারে অথচ এলোমেলোভাবে গাছের উপর ছড়িয়ে রেখেছে। এদের ব্যাপক আক্রমণে আশ্রয়দাতা গাছগুলি অচিরেই অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারকে

চৌর্যবৃত্তি বা রাহাজানি বললে কিছুমাত্র অতিশয়োক্তি হবে না। আমাদের দেশে একটু অধিক বয়স্ক আম, জাম, জিউল প্রভৃতি গাছের গায়ে পর-সরিষা ও রাম্না নামক কয়েক জাতীয় পরভোজী উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। পর-সরিষার কাণ্ড কালক্রমে আশ্রয়দাতা বৃক্ষ-কাণ্ডের সঙ্গে বেমালুম মিশে যায় এবং তারই রস শোষণ করে পরিপুষ্ট হতে থাকে। কিন্তু রাম্না প্রধানতঃ গাছের জীর্ণ বাকল বা ডালপালা থেকেই আহার্য সংগ্রহ করে থাকে। রাম্নার ব্যাপারটা পুরোপুরি চুরি না হলেও পর-সরিষার আহার সংগ্রহের উপায়টাকে চৌর্যবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

উদ্ভিদ-জগতে ভয়াবহ ডাকাতি বা রাহাজানির দৃষ্টান্ত দেখা যায়—বট, পাকুর, অশ্বত্থ প্রভৃতি বড় বড় উদ্ভিদের ব্যবহারে। এই সকল উদ্ভিদ প্রধানত পরভোজী হলেও নরম অথবা শক্ত মাটি থেকেও স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠতে পারে। এক-একটা বটগাছ মাটিতে জন্মগ্রহণ করে ভূমির সমান্তরালে বহু দূর পর্যন্ত ডালপালা বিস্তার করে দেয়। এদের আওতায় পড়ে অন্যান্য গাছপালা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। পুরাতন বাড়ীর ফাটলে এবং ইষ্টকস্তূপে প্রায়ই বট ও অশ্বত্থ গাছ জন্মে থাকে। শৈশবাবস্থায় এই সকল গাছের তেমন বৃদ্ধি না ঘটলেও ইষ্টকের ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শিকড় চালিয়ে দেয়। অসংখ্য শিকড়ের সাহায্যে যথেষ্ট পরিমাণ রস শোষণ করবার ব্যবস্থা এবং তৎসহ বনিয়াদ সুদৃঢ় হলেই গাছগুলি যেন তর্‌তর্‌ করে বাড়তে থাকে তখন অল্পদিনের মধ্যেই ডালপালা বিস্তার করে চতুর্দিকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। বট, অশ্বত্থের কবলে পড়ে অনেক পুরাতন মন্দির, জীর্ণ অট্টালিকা বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে—এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। প্রকাণ্ড একটা বটগাছ শিকড়ের পরে শিকড় চালিয়ে একটা জীর্ণ মন্দিরকে কুক্ষিগত করেছে—এ দৃশ্যে বিস্ময় জাগালেও কারুণ্যরস উদ্রিক্ত হয় না। কিন্তু একটা জীবন্ত উদ্ভিদ তার আশ্রয়দাতা অপর একটা জীবন্ত উদ্ভিদকে নাগপাশে বন্ধন করে ধীরে ধীরে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলছে—এ দৃশ্য বড়ই মর্মান্তিক। অনেক দিন পূর্বে ফরিদপুরের কোনও স্থানে চার-পাঁচ বছরের একটা খেজুর গাছের বালতোর খাঁজে তিন চার ইঞ্চি লম্বা একটা অশ্বত্থের চারা দেখেছিলাম। চারাটার কাণ্ডের দৃঢ়তা দেখে নেহাৎ কচি বলে বোধ হল না। ইতিমধ্যেই সে প্রায় তিন-চার হাত লম্বা কয়েকটা শিকড় নামিয়ে দিয়েছে। একটা শিকড় থেকে আবার কতকগুলি শাখা-প্রশাখা নির্গত হয়েছে। এই শিকড়টার অগ্রভাগ প্রায় মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিল। জিনিসটা তুচ্ছ বটে; কিন্তু মনের মধ্যে একটা ছাপ রয়ে গেল এই জন্য যে, চারাটা যা কিছু আহার্য পদার্থ সংগ্রহ করছে, দেহপুষ্টির জন্য ব্যয় না করে তার অধিকাংশই শিকড়ের দিকে প্রেরণ করছে। শিকড় বৃদ্ধি পেয়ে একবার মাটির নাগাল পেলেই তার ভবিষ্যৎ আহারের সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান-স্থলের ভিত্তিও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। বছর তিনেক পর সেই গাছটাকে দেখে বিস্মিত হলাম। অশ্বত্থের শিকড়গুলি খুবই মোটা হয়ে উঠেছে। আরও অসংখ্য নূতন শিকড় মাটির মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া মোটা মোটা

কাছির মত কতকগুলি শিকড় খেজুর গাছটাকে যেন নাগপাশে বন্ধন করে ফেলেছে। গাছটাও ইতিমধ্যে অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল; তার সর্বোচ্চ ডগাটি খেজুরের ডালকেও ছাড়িয়ে গেছে। খেজুর গাছটাকে আর পূর্বের মত সতেজ দেখলাম না। তার গলায় একটা শিকড় সুদৃঢ় ফাঁসের মত জড়িয়েছিল। তাল, খেজুর প্রভৃতি একপত্রবীজ উদ্ভিদের গঠন-প্রণালী সাধারণ উদ্ভিদের মত নয়। কাজেই গলায় ফাঁস লাগবার ফলে তার রসসঞ্চালন-ক্রিয়া বোধ হয় ক্রমশ কমে আসছিল। এর পাঁচ বছর পরে আর একবার গাছটাকে দেখতে গিয়েছিলাম। তখন দেখলাম, বিরাট এক অশ্বত্থ গাছের আওতায় সে স্থানের দৃশ্য সম্পূর্ণ বদলে গেছে। বাইরে থেকে খেজুর গাছটির চিহ্নমাত্রও দেখা যায় না। কেবল এক স্থানে শিকড়ের ফাঁকের মধ্য দিয়ে অতিকষ্টে জীর্ণপ্রায় সামান্য একটু অংশ দেখতে পেয়েছিলাম। বট অথবা অশ্বত্থ গাছ এই ভাবে বড় বড় তাল, খেজুর ও অন্যান্য গাছকে নাগপাশে বন্ধন করেছে—ডায়মণ্ড-হারবার, ফলতা এবং অন্যান্য স্থানে এরূপ দৃশ্য প্রায়ই নজরে পড়বে। বট, অশ্বত্থ গাছ, কড়ুই, শিমূল প্রভৃতি বড় বড় গাছকেও আক্রমণ করে। তবে তাল বা খেজুর গাছের মত তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। কারণ প্রধান গাছটি মরে গেলেও তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি অনেক সময় আক্রমণকারীর অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং দুর্ঘটনায় সাক্ষী-স্বরূপ পরানুগ্রহপুষ্টরূপে কোনক্রমে জীবন ধারণ করে।

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫০)

শিকারী গাছের কথা

প্রাণীদের মধ্যে একে অন্যকে হত্যা করে জীবন ধারণ করে—এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখে থাকবে। কিন্তু উদ্ভিদেরা জ্যান্ত প্রাণীদের ধরে খায়—এরূপ ব্যাপার কখনও প্রত্যক্ষ করেছ কি? তোমাদের অনেকেই হয়ত এরূপ শিকারী উদ্ভিদের কথা পড়েছ, কিন্তু আমাদের দেশেও যে এরূপ অনেক শিকারী উদ্ভিদ রয়েছে সে খবর বোধ হয় অনেকেই রাখ না। একটু কষ্ট স্বীকার করে খোঁজ করলে আমাদের দেশে এমন কি কলকাতার আশেপাশে খালবিলে অথবা বালুকাময় পতিত জমিতে এ ধরনের অনেক উদ্ভিদ দেখতে পাবে।

বিভিন্ন জাতের গাছপালা যে অপূর্ব কৌশলে জীবন্ত প্রাণীদের ধরে উদরস্থ করে—একথা জানা গেছে বহুকাল পূর্বেই। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে চার-শ' বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ৪০/৫০ বছর পূর্বেও শিকারী উদ্ভিদ সম্বন্ধে এমন সব রোমাঞ্চকর কাহিনী প্রচলিত ছিল, যা শুনে ভয়ে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। অনেকে আবার প্রত্যক্ষদর্শীর মত কোন কোন উদ্ভিদের মানুষ-শিকারের রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাঝে মাঝে এখনও যে এমন দু-একটা কাহিনী শোনা যায় না এমন নয়।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ দিকে এলে বানুর নামে একটা দ্বীপ আছে। লোকে এটাকে বলে—মৃত্যুর দ্বীপ। ১৮৫১ সালে ক্যাপ্টেন আর্করাইট বলেছেন যে, তিনি এই দ্বীপে একরকমের অদ্ভুত ফুল দেখেছিলেন। ফুলটা নাকি এত বড় যে, একটা মানুষ তার ভিতরের গর্তের মধ্যে ঢুকে যেতে পারে। গর্তটা নাকি ছোটখাট একটা গুহার মত। ভিতরটা যেমন রঙচঙে তেমনি সুগন্ধে ভর্তি। গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যদি কেউ সেই ফুলের গর্তে ঢুকে পড়ে তবে তার আর রক্ষা নেই। গন্ধের অপূর্ব মাদকতা শক্তির বলে সে সেখানে অসাড় হয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাপড়িগুলো উল্টে এসে তার বহির্গমনের পথ বন্ধ করে দেয়। শিকার হজম হয়ে গেলে পাপড়ি মেলে ফুলটা আবার নতুন শিকারের সন্ধানে হাঁ করে বসে থাকে।

আমেরিকান ন্যাচারেলিস্ট মিঃ ডানস্টান একরকম শিকারী লতাগাছের কথা বলেছেন। নিকারাগুয়ার জলাভূমিতে উদ্ভিদ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাঁর কুকুরটা নাকি এরকমের একপ্রকার লতাগাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সংবাদপত্রের

বিবরণ থেকে মেক্সিকোর সিয়েরা ম্যাডার নামক অঞ্চলের সর্প-বৃক্ষ নামে একরকম প্রাণী-শিকারী উদ্ভিদের বিবরণ জানা যায়। এই উদ্ভিদের নাকি সাপের মত কতকগুলো ডাল বেরোয়। এই ডাল ভয়ানক স্পর্শ-কাতর। পাখি বা অন্য কোন ছোট প্রাণী এর উপর বসামাত্রই ডালগুলো তাকে জড়িয়ে ফেলে এবং বেমালুম গাছের ভিতর টেনে নিয়ে যায়। এক পর্যটনকারী বলেছেন যে, দৈবাৎ এরকম একটা ডালের সংস্পর্শে আসামাত্রই ডালটা তার হাত জড়িয়ে ধরে। অতিকষ্টে ছাড়িয়ে আনতে পারলেও তার হাত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

সবচেয়ে রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনা যায়—ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছ সম্বন্ধে। আফ্রিকার পূর্বদিকে ম্যাডাগাস্কার একটা বৃহৎ দ্বীপ। এই দ্বীপে নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল। ডঃ কার্ল লাইক নামে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ম্যাডাগাস্কার দ্বীপের মানুষ-খেকো গাছের কথা প্রকাশ করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি নাকি স্বচক্ষে এরকম একটা দৃশ্য দেখেছিলেন। বিভিন্ন সাময়িক ও বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় তার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এমন কি, ১৯২০ সালেও এই বিবরণীর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে। ডঃ লাইকের বিবরণ থেকে জানা যায় – এই মানুষ-খেকো গাছটা নাকি দেখতে বিরাট একটা আনারস গাছের মত। স্থানীয় অধিবাসীরা এই গাছকে পবিত্র জ্ঞানে পূজা করে থাকে। গাছের কাণ্ডটা প্রায় দশফুট উঁচু প্রকাণ্ড একটা পিপের মত। গাছটার মাথার দিক থেকে ১০/১২ ফুট লম্বা এবং ফুটখানেক চওড়া ৮টা চ্যাপ্টা পাতা ঝুলে থাকে। পাতাগুলোর ডগার দিকটা ক্রমশ সরু হতে হতে সূচের মত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে। তাছাড়া পাতার গায়ে অসংখ্য বিষাক্ত কাঁটাও আছে।

একবার রাত্রিবেলায় এরূপ একটা গাছের কাছে একটি মেয়েকে বলিস্বরূপ উৎসর্গ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা ডঃ লাইককে এই অনুষ্ঠানটা দেখাতে নিয়ে যায়। অধিবাসীরা একটি যুবতী স্ত্রীলোককে ধরে নিয়ে এসে তাকে গাছটার উপরে উঠিয়ে সেখানে সঞ্চিত একরকমের তরল পদার্থ পান করাতে বাধ্য করালো। ডঃ লাইক লিখেছেন —"আমি ভেবেছিলাম মেয়েটা গাছটার উপর থেকে লাফিয়ে পড়বে এবং ব্যাপারটার ওখানেই যবনিকাপাত হবে। কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা তা নয়, ওখানে কি ঘটছে সেটা হৃদয়ঙ্গম করে একটা অস্বাভাবিক ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পূর্বেও যে গাছটাকে সম্পূর্ণ নিশ্চল এবং অসাড় বলে মনে হচ্ছিল সে যেন অকস্মাৎ প্রাণবন্ত হয়ে উঠল।

যে সবুজ পাতাগুলোকে শক্ত ও অনমনীয় বলে মনে হয়েছিল সেই পাতাগুলোই মেয়েটাকে সাপের মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে মোচড় দিতে লাগল। মেয়েটা তখন বস্তুপিণ্ডের মতো নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, সেই সময় এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য নজরে পড়লো যা জীবনে কখনো ভোলবার নয়। সেই বিরাট পাতাগুলো খুব ধীরে ধীরে খাড়া হতে লাগলো। তারপর চাপ দেওয়া মেশিনের

মত প্রচণ্ড চাপে ভীষণ-দর্শন কাঁটাগুলোকে শরীরে বিদ্ধ করে মেয়েটাকে সম্পূর্ণরূপে মুড়ে ফেললো।"

দুঃখের বিষয়, এসব রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আজ পর্যন্ত এরূপ কোন শিকারী গাছের সন্ধান পাওয়া যায় নি। যে সব শিকারী গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে তারা কীট-পতঙ্গ বা ছোটখাট পাখি এবং টিকটিকি, ব্যাং, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণীদের শিকার করেই দেহসাৎ করে মাত্র। এদের শিকার ধরার কৌশল যেমন বিচিত্র তেমনই কৌতূহলোদ্দীপক। শিকারী উদ্ভিদের অনেকেই জলে অথবা জলাভূমিতে জন্মে থাকে। তাই নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করবার জন্যে তারা প্রাণীদেহ আত্মসাৎ করবার উপায় বেছে নিয়েছে। অবশ্য প্রাণীজ নাইট্রোজেন ছাড়াও চলে এমন অনেক গাছ আছে; কিন্তু প্রাণীজ নাইট্রোজেন সংগ্রহের ফলে দেহের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির অনেক সহায়তা হয়ে থাকে। এছাড়া ব্যাঙের ছাতা জাতীয় অনেক উদ্ভিদ আছে যারা খাদ্যের জন্যে প্রাণীদের উপরই নির্ভর করে থাকে। বিভিন্ন জাতের শিকারী উদ্ভিদ বিভিন্ন রকমের ফাঁদ পেতে শিকার আয়ত্ত করে। কারোর থাকে গর্ত-ফাঁদ, কারোর আঠালো পাতার ফাঁদ, কারোর বজ্র-আঁটুনি ফাঁদ আবার কারোর থাকে ইঁদুর ধরা ফাঁদ। গর্তফাঁদের মধ্যে ঘটিলতা, শিকারীর শিঙ্গা প্রভৃতির ফাঁদের কৌশলই বোধ হয় সব চাইতে সরল। কারণ শিকার ধরবার জন্যে এদের মোটেই নড়াচড়া করতে হয় না। ঘটি বা শিঙ্গার ঢাকনাটা খুলে হাঁ-করে বসে থাকে। লোভের বশে কীটপতঙ্গ এসে গর্তের ভিতরে ঢুকে যায়। নীচের দিকে মুখকরা শোঁয়ার দরুণ আর বেরিয়ে আসতে না পেরে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ আমেরিকার হেলিয়ামফোরা, উত্তর আমেরিকার সারাসেনিয়া, আমাদের দেশীয় নেপেন্‌থেস্‌ প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদেরা এইভাবেই শিকার ধরে থাকে। অন্যান্য শিকারী উদ্ভিদগুলো কেউ উজ্জ্বল রং, কেউ গন্ধ, কেউ মধু এবং কেউ বা সুমিষ্ট আঠার সাহায্যে শিকারকে আকৃষ্ট করে ফাঁদে চেপে ধরে। ভেনাস ফ্লাই-ট্র্যাপ, ডাইওনিয়া ব্লাডারওয়ার্ট, সূর্যশিশির, জেন্‌লিসিয়া, ড্রসোফাইলাম, ইউট্রিকুলেরিয়া প্রভৃতি এ ধরনের উদ্ভিদ।

সূর্যশিশির, ড্রসোফাইলাম প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদগুলোর পাতার গায়ে ছোট ছোট ফোঁটার মত আঠালো পদার্থ লেগে থাকতে দেখা যায়। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ পাতার উপর উপবেশন করলে আঠায় জড়িয়ে যায়। অনেক উদ্ভিদের আঠা যেমন একটু টানলেই সুতার মত লম্বা হয়ে আসে এদের সে রকমের নয়। মশা, মাছি পাতার উপর বসামাত্রেই এই আঠা ডেলার মত তাদের গায়ে লেগে যায়। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করবার ফলে ক্রমশ অনেকগুলো আঠার ডেলা শরীরে বিভিন্ন জায়গায় লেগে যাওয়ায় সে আর উড়ে পালাতে পারে না এবং উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, এভাবে আটক পড়ে মশার মত প্রাণী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হজম হয়ে গেছে। ডায়োনিয়া

প্রভৃতি শিকারী উদ্ভিদের পাতার দুধারে দাঁতের মত কতকগুলো সংকোচনশীল শোঁয়া আছে। কোন কীটপতঙ্গ পাতার উপর বসামাত্রই ধারগুলো দাঁতে দাঁতে মুড়ে দিয়ে শিকারকে ইঁদুর কলের মতো চেপে ধরে। কোন কোন ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদ অদ্ভুত উপায়ে শিকার ধরে থাকে। এরা সাধারণত ইল-ওয়ার্ম নামে এক রকমের কৃমিজাতীয় পোকা শিকার করে। তোমরা বোধহয় ল্যাসোর কথা শুনেছ। অতি সহজ উপায়ে বুনো জীবজন্তু ধরার জন্য 'ল্যাসো' ব্যবহৃত হয়। একপ্রান্তে আলগাভাবে ফাঁস পরানো একটা লম্বা দড়িকে বলা হয় 'ল্যাসো'। দড়িটাকে গুটিয়ে নিয়ে শিকারী অব্যর্থ লক্ষ্যে ধাবমান জন্তুর উপর ছুঁড়ে দেয়। ফাঁসটা গলায় জড়িয়ে গিয়ে জন্তুটা আটকা পড়ে যায়। অনেক শিকারী 'ল্যাসো' দিয়ে বাঘ, ভাল্লুক, অজগর প্রভৃতি হিংস্র জীবন্ত ধরে আনে। ড্যাক্‌টিলেরিয়া নামে একজাতীয় ছত্রাকের সূতার মত লম্বা শিকড়ের ডগার দিকে 'ল্যাসোর' মত ফাঁস থাকে। ঘোরাফেরা করবার সময় কোন কৃমিপোকা অসাবধানে ওই ফাঁসের মধ্যে ঢুকে পড়লে আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গেই ফাঁসগুলো ফুলে উঠে শিকারটাকে চেপে ধরে। পরে নতুন নতুন ছত্রাক-সূত্র বেরিয়ে এসে শিকারের দেহের ভিতর প্রবেশ করে। কোন কোন ছত্রাক-সূত্রের ফাঁসটা থাকে ভয়ানক আঠালো। শিকার সেই আঠায় আটকে যায়।

আগেই বলেছি, আমাদের দেশের কয়েক রকমের শিকারী উদ্ভিদ দেখা যায়। এদের কয়েকটার শিকার প্রণালী যতটা লক্ষ্য করেছি, সেকথা বলছি। অনেকদিন আগে আমাদের লেবোরেটরীর (বসু বিজ্ঞান মন্দিরের) গাছ-ঘরে শিলং বা ওদিককার কোন অঞ্চল থেকে আনা কয়েকটা ঘটি-লতা গাছ লাগানো হয়েছিল। গাছগুলো প্রায় মানুষের সমান উঁচু। পাতাগুলো বেশ লম্বা এবং চওড়া। পাতার ডগায় একটা সরু, লম্বা বোঁটা। প্রত্যেকটা বোঁটার শেষের দিকে বেশ বড় একটা ঘট খাড়াভাবে থাকে। ঘটটা লম্বায় ৪।৫ ইঞ্চির কম নয়। ঘটগুলি দেখতে সাধারণ মাটির ঘটেরই মত; কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটা ঘটই একদিকে খানিকটা বাঁকানো। প্রত্যেকটা ঘটের মুখে কব্জাওয়ালা ঢাক্‌নার মত একটা ছোট্ট পাতা আছে। এই ঢাক্‌নাপাতাটাকে সবসময়েই প্রায় আধবোজা অবস্থায় থাকতে দেখেছি। ঘটের কানাটা দেখে মনে হয় যেন মানুষের হাতের তৈরী। কোন সুনিপুণ কারিগর যেন একগাছা সূক্ষ্ম তার স্প্রিঙের মত করে কানাটার গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। কতকটা অস্বাভাবিক পরিবেশে থাকার জন্যে বোধ হয় গাছগুলোর উপর অনেকদিন পর্যন্ত কোন পোকা-মাকড়ের আনাগোনা দেখতে পাই নি। যা হোক ওদের শিকার-কৌশলটা প্রত্যক্ষ করবার আগ্রহে কয়েকটা ঘটের ঢাক্‌নার উপর খানিকটা চিনির রস ছড়িয়ে দিয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে সুরু করলাম। প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল। চিনির লোভে একটা, দুটা করে ক্রমশ অনেকগুলো বড় বড় ডেয়ো-পিঁপড়ে এসে পাতার উপর ভিড় জমাতে লাগলো। কিন্তু একটারও ঘটের

ভিতরে ঢোকবার আগ্রহ দেখা গেল না ; চিনি খেতেই সবাই ব্যস্ত। পরের দিন গিয়ে দেখি—চিনির চিহ্নমাত্র নেই—তবুও পিঁপড়েরা লোভ ছাড়তে পারে নি ; পাতার উপর, ঘটির গায়ে—বোধ হয় চিনির সন্ধানেই আনাগোনা করছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর দেখলাম, অতিমাত্রায় কৌতূহলী একটা পিঁপড়ে ঘটের কানা বেয়ে খানিকটা ভিতরে চলে গেছে। ভেবেছিলাম, হয়তো ঢাক্‌নাটা তখনই বন্ধ হয়ে গিয়ে পিঁপড়েটাকে আটক করে ফেলবে কিন্তু ঢাক্‌নাটার সেরকমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। পিঁপড়েরা কিন্তু আর ভিতরে না গিয়ে, খানিক বাদেই বেরিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে দেখি, দুটো পিঁপড়ে এসে প্রায় এক সঙ্গেই ঘটের ভিতরে উঁকি মেরে দেখছে, একটা একটু বেশি ভিতরে গিয়ে নীচের দিকে মুখকরা সূক্ষ্ম শোঁয়াগুলোর উপর টাল সামলাবার চেষ্টা করছিল। ইতিমধ্যেই হঠাৎ যেন পিঁপড়েটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুসন্ধানে বুঝলাম—পিঁপড়েটা পা পিছলে ঘটের ভিতড়ে পড়ে গেছে। দিন তিনেক পরে একটা ঘট চিরে তার ভিতরে অর্ধ-গলিত বড় একটা উচ্চিংড়ি এবং গোটা সাতেক ডেয়ো-পিঁপড়ে পাওয়া গেল।

শান্তিনিকেতনের কাছে কোপাই নদীর দিকে যাবার সময় মনে হলো বালির উপর এদিকে ওদিকে যেন পানের পিক পড়ে রয়েছে। কাছে গিয়ে দেখি, একরকমের ছোট ছোট গাছ। দেখতে অনেকটা ছোট্ট টোকাপানার মত। ধারগুলো টকটকে লাল। এজন্যেই দূর থেকে পানের পিক বলে মনে হয়। পাতার চারদিকে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শোঁয়া। এরা কীট-পতঙ্গ শিকার করে শরীর পোষণ করে। গাছগুলো ড্রসেরা জাতীয়। অনেকক্ষণ অনুসন্ধান করবার পর একটা পাতার উপর ছোট্ট একটা পোকা দেখতে পেলাম।

পোকাটার পিছনের দিকটা শোঁয়ায় জড়িয়ে যাওয়ায় সে সেগুলোর কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করছিল, কিন্তু এদিকে যে আবার অন্যান্য শোঁয়াগুলো মুড়ে এসে তাকে বন্দী করবার উদ্যোগে ছিল—এবিষয়ে মোটেই কোন ধারণা ছিল না। প্রায় ঘণ্টা খানেক সময়ের মধ্যে শোঁয়াগুলো মুড়ে গিয়ে পোকাটাকে বেমালুম বন্দী করে ফেললো। এ অবস্থায় খানিকটা মাটি সমেত গাছটাকে তুলে নিয়ে এসেছিলাম। একদিন পরে পাতাটার সেই কোঁচকানো অংশটুকু ছিঁড়ে তার মধ্যে পোকাটার শরীরের সামান্য এক আধটুকু চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাই নি।

বর্ষাকালে মানিকতলা খালের মধ্যে অন্যান্য জলজ উদ্ভিদের সঙ্গে একরকমের জলজ শিকারী উদ্ভিদ পেয়েছিলাম। উদ্ভিদগুলো ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয়। দেখতে সাধারণ জল-ঝাঁঝির মত, কিন্তু রংটা ফিকে সবুজ এবং পাতাগুলো খুব সরু। ডাঁটার প্রত্যেকটা গাঁটের কাছ থেকে অনেকগুলো করে ছোট ছোট, অর্ধ গোলাকৃতি পেটিকা জন্মে থাকে। এই পেটিকাগুলোই শিকার ধরবার যন্ত্র। জলজ কীটাণুগুলোকে পেটিকায় আবদ্ধ করে উদরসাৎ করতে থাকে। নিম্নশক্তির

বাইনোকুলার মাইক্রস্কোপের তলায় রেখে এদের শিকার কৌশল যা প্রত্যক্ষ করেছি তা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক।

তোমরা ইচ্ছা করলে অনায়াসে খাল-বিল থেকে এই শিকারী উদ্ভিদ সংগ্রহ করে ঘরে বসে, মাইক্রস্কোপের অভাবে অন্তত ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়েও তাদের শিকার কৌশল প্রত্যক্ষ করতে পার।

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এপ্রিল, ১৯৪৯)

গাছপালার বংশবিস্তারের ফন্দি

****

প্রাণী-জগতের বংশবিস্তারের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হবার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক প্রবৃত্তি উদ্ভিদ জগতেও সুপরিস্ফুট। প্রাণীরা যেরকম একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াত করে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ লাভ করতে পারে, অধিকাংশ উদ্ভিদের সেরকম ক্ষমতার অভাব সত্ত্বেও তারা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আপন আধিপত্য বিস্তার করে নিয়েছে। সাধারণত উদ্ভিদের এত বীজ উৎপন্ন হয় যে, বিবিধ অবস্থার প্রতিকূলতায় তাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হয়ে গেলেও একেবারে বংশলোপের আশঙ্কা ঘটে না। বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থায় পড়ে অধিকাংশ বীজ নষ্ট হবার দরুনই বোধ হয় ক্রমবিকাশের ফলে এমন বীজের উদ্ভব হয়েছে, যাদের বহির্ভাগ কঠিন আবরণে আবৃত। কঠিন বহিরাবরণে সুরক্ষিত থাকার ফলে অভ্যন্তরস্থ বৃক্ষশিশু অতিরিক্ত শৈত্য বা উত্তাপে নষ্ট হয়ে যায় না। কিন্তু কেবল বীজ সুরক্ষিত হলেই ত বংশবিস্তারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বীজ পরিপক্ক হলে বৃক্ষের তলায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। শক্ত খোলার আবরণে সুরক্ষিত থেকে সময়মত না হয় বীজ উপ্ত হবার সুবিধাই হল, কিন্তু আর এক বিপদ তখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অল্পপরিসর স্থানের মধ্যে একযোগে অসংখ্য বৃক্ষশিশু জন্মে যখন ক্রমশ বাড়তে থাকে তখন আলো, বাতাস ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। তার ফলে অধিকাংশই জীবনসংগ্রামে পরাভূত হয়। অধিকন্তু এই উপায়ে পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের গতিও মন্থর হয়ে পড়ে। এই সব অসুবিধার ফলেই হয়ত উদ্ভিদেরা বংশবিস্তারের জন্য ক্রমশ অভিনব কৌশল আয়ত্ত করতে বাধ্য হয়েছে। অনেকেই বংশবিস্তারে প্রাণীজগতের সাহায্য নিয়েছে। জীবজগতে লেশমাত্র স্বার্থশূন্য হয়ে কেউ কোন কাজ করে না। এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করেই যেন আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি সুরসাল ফলের গাছসমূহ তাদের বীজকোষের উপরে মনুষ্য ও পশুপক্ষীর রসনাতৃপ্তিকর মাংসল পদার্থের বেষ্টনী সৃষ্টি করে দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হবার উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে। প্রাণীরা সুস্বাদু ফলের লোভে নানা উপায়ে দেশদেশান্তরে এদের বংশবৃদ্ধির সুযোগ ঘটিয়ে দেয়। বিশেষত মানুষেরা কেবল ফলের লোভে নয়, ফলের সৌরভ, পত্র পল্লবের সৌন্দর্য ও অন্যান্য নানা প্রয়োজনে এগুলিকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সাহায্য করে থাকে। তাদের কেউ কেউ মানুষের অপরিসীম আদরযত্নে লালিতপালিত হয়ে প্রজনন-ক্ষমতা পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। ডাল

কেটে বা কলম করে তাদের বংশ বৃদ্ধি করাতে হয়। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনে লাগে না পৃথিবীতে এমন উদ্ভিদের সংখ্যা কম নয়। বংশবৃদ্ধির জন্য তাদের চেষ্টারও বিরাম নেই। বংশবিস্তার করে পৃথিবীর উপর আধিপত্য করবার উদ্দেশ্যে তারা কতরকম অদ্ভুত ফন্দির আশ্রয় নিয়েছে, সেই সম্বন্ধে বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের দেশীয় কয়েকটি উদ্ভিদ কথা আলোচনা করব। এই উদ্দেশ্যে আমাদের দেশীর কোন কোন উদ্ভিদের জলস্রোত বা বাতাসের সাহায্য গ্রহণ করেছে। কেউ কেউ লতানো সংবাহক বা ফল দূরে ছিটিয়ে বংশ বিস্তার করে থাকে। কেউ কেউ আবার প্রাণীদের গাত্রসংলগ্ন হয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়বার কৌশল আয়ত্ত করেছে। এইরূপ বিভিন্ন উপায় অবলম্বনকারী উদ্ভিদদের সম্বন্ধে আমরা ক্রমশ আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত পূর্ববঙ্গের* খাল বিল বা অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমির ধারে ধারে বুনো বা শ্বেত-মাকাল নামে এক জাতীয় বড় বড় গাছ জন্মাতে দেখা যায়। এদের ঈষৎ হরিদ্রাভ শ্বেতবর্ণের ফুলের স্তবকগুলি দেখতে অতি সুন্দর ; কিন্তু গন্ধ বড়ই অপ্রীতিকর। গাছে মাকাল ফলের মতই বড় বড় গোলাকার ও শ্বেতবর্ণের ফল ধরে। পরিপক্ক অবস্থায়ও রঙের পরিবর্তন হয় না। ফলগুলি পেকে ফেটে গেলে একটা ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধ নির্গত হয়। মানুষ ত দূরের কথা, পশুপক্ষীরাও দুর্গন্ধে এদের কাছে ঘেঁষে না। কাজেই পশুপক্ষীদের দ্বারা বংশ-বিস্তারের সহায়তার কোন সম্ভাবনা ত নেই-ই, অধিকন্তু মানুষেরা তাদের বংশ লোপ করতেই সর্বদা সচেষ্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা যেন মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে বংশ বিস্তার করে চলেছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাওয়া যাবে জলের ধারে ধারেই এই গাছের প্রাচুর্য। বর্ষার জলে যখন সমস্ত মাঠ ঘাট ডুবে যায় এবং খাল-বিলে জলস্রোত বইতে থাকে সেই সময়েই এদের ফল পেকে জলে পড়ে এবং ভাসতে থাকে। জলস্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে ফলগুলি বহু দূরে দূরে চলে যায়। এইরূপে কেউ কেউ জলস্রোতের আশেপাশে আবর্জনা বা ফাঁকফন্দীতে আটকা পড়ে যায় এবং অনেকে ইতস্তত ভাসতে ভাসতে বর্ষার অবসানে জল নামবার পর ডাঙ্গা পেলেই অঙ্কুরোদগম করতে থাকে। বৃক্ষশিশুগুলি অসম্ভব দ্রুতগতিতে লম্বালম্বি বেড়ে পুনরায় বর্ষা-সমাগমের পূর্বেই বেশ বড় হয়ে উঠে। পরবর্তী বর্ষার জলে সে কোন গতিকে মাথা উঁচু করে দু-চারটি পাতা বা কোন কোন স্থলে পত্রহীন অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর আর বছরখানেক সময়ের মধ্যেই দস্তুরমত গা ঝাড়া দিয়ে বেড়ে ওঠে। এই ফন্দি অবলম্বন করে তারা নিশ্চিন্তভাবে খালবিলের আশেপাশে বংশবিস্তার করে চলেছে।

হিজল নামে একপ্রকার গাছও শ্বেত মাকালের মত উপায় অবলম্বন করে বংশ-

* এই প্রবন্ধ লেখবার সময় বাংলাদেশ অবিভক্ত ছিল।

বিস্তার করে থাকে। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই হিজল গাছে অজস্র লাল রঙের ফুল ফুটতে থাকে। জলের ধারে ধারেই হিজল গাছের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই বর্ষাকালে গাছের তলায় জলের উপর এত ফুল পড়ে থাকে যে দেখে মনে হয়—কে যেন জলের উপর লাল মখমলের চাদর বিছিয়ে রেখেছে। জল নেমে যাবার পূর্বেই হিজলের ফল পাকে এবং জলের উপর পড়ে ভাসতে ভাসতে দূরদূরান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

মানুষের অতি প্রয়োজনীয় নারকেল ফলের পূর্বকথা আলোচনা করলে অনুরূপ ইতিহাসেরই সন্ধান মিলবে। মানুষ যখন এই ফলের ব্যবহার শিখে নাই তখন পর্যন্ত একমাত্র জলস্রোতই তাদের বংশবিস্তারে সাহায্য করত। সমুদ্রের উপকূলে নোনা জায়গায় এরা প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। শুকনো নারকেল নদী বা সমুদ্রজলে ভেসে বহু দূরে উপনীত হয়ে সুবিধামত স্থানে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে নিত। এখন মানুষেরাই তাদের সেই উপায় অবলম্বনের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

কতকগুলি গাছ আবার বংশবিস্তারের জন্য বীজের উপর নির্ভর করে না; এদের বীজ বড় একটা হয় না; আর হলে তা থেকে অঙ্কুরোদগম হয় না। বংশবিস্তারের জন্য এরা তাদের মূল কাণ্ড থেকে লতার মত এক প্রকার প্রবাহণী বের করে দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, এক জাতীয় গুঁড়িকচু গাছের উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের ফল হয় বটে, কিন্তু বীজ থেকে গাছ জন্মে না। বংশ-বিস্তারের জন্য এরা অতি সহজ উপায় অবলম্বন করেছে। গোড়ার দিক থেকে খুব সরল প্রায় পাঁচ-সাত হাত লম্বা লতার মত কতকগুলি প্রবাহণী চতুর্দিকে চালিয়ে দেয়। প্রত্যেক প্রবাহণীর প্রান্তদেশে একটি গাঁট থাকে উপযুক্ত স্থান পাওয়ামাত্র ঐ গাঁটটিতে একটি নূতন চারাগাছ গজাতে থাকে এবং শিকড় গেড়ে সেইস্থানে আধিপত্য বিস্তার করে। কিছুদিনের মধ্যেই এই নূতন উপনিবেশ আবার প্রবাহণী ছড়াতে আরম্ভ করে এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তৃত ভূখণ্ড অধিকার করে ফেলে। পানা জাতীয় বিবিধ জলজ উদ্ভিদ—বিশেষত সর্বজন-পরিচিত কচুরি পানা অনুরূপ উপায়েই দ্রুতগতিতে বংশবিস্তার করে থাকে। নূতন গাছগুলি পরিণত হলেই সাধারণত এই সংযোগকারী প্রবাহণী নষ্ট হয়ে পুরাতন গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশে এক জাতীয় ধান জন্মাতে দেখা যায়। গাছে ধান ফললেও প্রায়ই শাঁস হয় না। কাজেহ বীজ থেকে তাদের বংশবিস্তারের সুবিধা হয় না। এই গাছেরগোড়ার দিক থেকে লম্বা লম্বা অসংখ্য ডাঁটা বের হয়ে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই এই ডাঁটার গাঁট থেকে ছোট ছোট চারাগাছ নির্গত হয়। এই চারা গাছগুলি ক্রমশ বড় হলেই তাদের ভারে ডাঁটাগুলি আপনা আপনিই মাটিতে নুয়ে পড়ে। তখন চারাগুলি শিকড় বের করে মাটি আঁকড়ে ধরে নূতন উপনিবেশ সৃষ্টি করে। এই ভাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক জাতীয় অর্কিডের মধ্যে দেখা যায় তারা গোড়া থেকে নূতন নূতন অঙ্কুর উৎপন্ন করে

বংশবৃদ্ধি করে ; কিন্তু বংশবিস্তারের জন্য উপর থেকে বটগাছের ঝুরির মত লম্বা লম্বা প্রসারণী নামিয়ে দেয়। প্রসারণীর প্রত্যেক গাঁটে গাঁটে একটি করে শিশু অর্কিড ঝুলতে থাকে। তারা অনেক দিন পর্যন্ত মাটির নাগাল পাবার আশায় শিকড় বের করতে থাকে। এই অবস্থায় হয়ত দু-চার বছর কেটে যায়—মাটির নাগাল পায় না, অবশেষে প্রসারণী শুকিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়বার পর চারাগুলি নূতন নূতন উপনিবেশ গড়ে তোলে।

পাথরকুচির গাছ আবার এ অপেক্ষাও অদ্ভুত উপায়ে বংশবিস্তার করে থাকে। পাথরকুচির বীজ থেকে বংশবৃদ্ধি হয় না। তাদের পাতার ধারে ছোট ছোট খাঁজ কাটা আছে। পাতা মাটিতে পড়ে কিছু দিন রোদ জল পেলেই প্রত্যেক খাঁজের কাছে এক একটি করে ছোট ছোট চারা উৎপন্ন হয়, পাতাগুলি গাছ থেকে পড়লেই জল, বাতাসের সহায়তায় দূরে দূরে নীত হয় এবং সুবিধামত স্থানে পাথরকুচির বৃহৎ উপনিবেশ সৃষ্টি করে। এছাড়াও এক স্থানে বহু গাছ জন্মাবার পর গাছগুলো ক্রমশই বাড়তে বাড়তে অবশেষে মাটিতে লতিয়ে পড়ে। এইভাবে কিছুদূর লতিয়ে যাবার পর সুবিধামত শিকড় বের করে ওখান থেকেই আবার নূতন করে উপনিবেশ সৃষ্টি শুরু করে দেয়।

বীজ থেকে যাদের বংশ বৃদ্ধি হয় এমন কতকগুলি গাছ নিজেরাই দূরে দূর বীজ ছড়াবার কৌশল উদ্ভাবন করেছে। আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে আমলী বা আমরুল শাক নামে এক জাতীয় ছোট ছোট লতানে উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এদের ফলগুলি লম্বা লম্বা—মাথা সূচালো। এক একটার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল রঙের বীজ থাকে। ফল পাকলে, একটুখানি বাতাস বা অন্য কোন রকমে নাড়াচাড়া পেলেই—ফলের খোসা সবেগে ফেটে বীজগুলি খুব জোরে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বীজগুলির গায়েও আবার খাঁজকাটা, কাপড়েচোপড়ে পড়লে, সূতার আঁশে আটকে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধা আছে।

ওকরা বা ঘাগড়া নামে ছোট ছোট একপ্রকার অযত্নবর্ধিত চারা গাছ মাঠে ঘাটে অনবরত দেখতে পাওয়া যায়। এদের ফলগুলি দেখতে কতকটা কুলবীজের মত। কিন্তু বীজের চতুর্দিক ঘিরে কতকগুলি কাঁটা জন্মে। কাঁটার মাথাগুলি কিন্তু সরল নয়—হুকের মত বাঁকানো। কাপড়চোপড়ে লাগলে আটকে যায়। গরু-বাছুরেরা মাঠে ঘাটে চরবার সময় লেজের লোমের গোছায় আটকিয়ে তারা দূর-দূরান্তরে উপনীত হয় এবং সুবিধা মত স্থানে অঙ্কুরিত হয়ে বংশ বৃদ্ধি করতে থাকে। দোপাটি ফুলের বীজও পাকলে আমরুল শাকের ফলের মত জোরে ফেটে যায় এবং বীজগুলি দূরে ছিটকে পড়ে। বংশবিস্তারের সুবিধার জন্যই তাদের এ কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছিল সন্দেহ নেই।

বনে জঙ্গলে একজাতীয় দুর্বাঘাস দেখতে পাওয়া যায়। একটি লম্বা ডাঁটার মাথায় ক্রুশ-চিহ্নের মত তার চারটি বাহুতে সারবন্দী ভাবে বীজ ধরে। বীজগুলি

পরিপক্ক হলে এক রকম সূক্ষ্ম শুঁয়ার সাহায্যে মানুষের কাপড়চোপড়ে আটকে দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

চোরকাঁটার বীজগুলিও কাপড়চোপড়ে বিঁধে দূরে দূরে ছড়িয়ে বংশবিস্তার করার সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করে নিয়েছে।

তেঁতুলে বা শালবনী গাছ বনে জঙ্গলে বা পরিত্যক্ত স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। ফলগুলি খুব ছোট ছোট চ্যাপ্টা তেঁতুলের মত দেখতে। গায়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য শুঁয়া আছে। পশুপক্ষীর গায়ে অথবা কাপড়চোপড়ে লাগলে আঠার মত লেগে থাকে। কৌশলে প্রাণীদের সাহায্য নিয়ে এরা বংশবিস্তার করে থাকে।

আপামার্গ বা আপাং গাছ সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকেরই অভিজ্ঞতা আছে। বনেজঙ্গলে একটু ঘুরলেই দেখা যাবে পরিধেয় বস্ত্রাদিতে কাঁটার মত ছোট ছোট অসংখ্য বীজ যেন সার বেঁধে লেগে আছে। এরাই আপাঙের বীজ। এরা চোরকাঁটার মত গায়ে অথবা জামাকাপড়ে ছড়িয়ে পড়বার এরূপ কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে।

(প্রবাসী, মাঘ, ১৩৪৭)

———

ব্যাঙের ছাতার আলো

'প্রবাসীতে'* আলো-দেওয়া গাছপালার বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী আমাকে এদেশীয় আলো-দেওয়া ব্যাঙের ছাতার কথা লিখেছিলেন। কিন্তু এ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি। সম্প্রতি Scientific American পত্রে আলো দেওয়া ব্যাঙের ছাতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছে। উক্ত প্রবন্ধ লেখক মারিল (W. A. Murril) বলেন, সৌভাগ্যক্রমে তিনি একজায়গার একটা বন্যভূমিতে অনেকগুলি আলো-দেওয়া ব্যাঙ ছাতা দেখেছিলেন। রাসায়নিক বিশ্লেষণ তাদের ভিতর থেকে একরকমের বিষাক্ত পদার্থ পাওয়া যায় ; ভেক এবং কচ্ছপ জাতীয় প্রাণীদের ওপর উক্ত বিষের ক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখা গেল, তাদের স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে আসে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় ; আবার মাথাঘোরা, বমন, অতিসার প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণও দেখা গিয়েছিল।

তিনি বলেন,-- জীবন্ত আলো-দেওয়া প্রাণীদের আলো বড় সংক্ষিপ্ত। আর তারা প্রায়ই থেকে থেকে আলো দেয়। কিন্তু ব্যাঙের ছাতা যে আলো দেয়, সেটা স্থির এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী, তাদের কোনটা কোনটা কয়েক সপ্তাহ ধরে—এমনকি মাসখানেক পর্যন্ত—অনবরত একটানা আলো দিতে পারে। ক্রমবিকাশ বা জীবনসংগ্রামবাদের ধারা অনুসরণ করে অনেকেরই মনে কৌতূহল জাগ্‌তে পারে গাছের বা ব্যাঙের ছাতার আলো বিকিরণ করবার তাৎপর্য কি? একথার সঠিক খবর দেওয়া অন্ততঃ আজ পর্যন্ত দুষ্কর। তবে জীব বা প্রাণীদের আলো দেওয়ার কারণ হয়ত জীবনসংগ্রামে টিকে থাকা অথবা বংশবিস্তারের একটা ফন্দীবিশেষ হতে পারে ; কিন্তু গাছে, আলোর ওই রকমের তো কোন তাৎপর্য বোঝা যায় না, তবে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে গাছের অথবা বেঙের ছাতার আলো বিকিরণ করাটাও তাদের বংশবিস্তারের একটা কৌশল মাত্র। তাদের আলোকে আকৃষ্ট হয়ে জোনাকী বা ওই জাতীয় অন্যান্য পোকা এসে তাদের গায়ের ওপর বসে এবং সে সময় বেঙের ছাতার বা গাছের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বীজাণু সকল তাদের গায়ে পায়ে লেগে যায়, আর তারা সেগুলোকে নানা স্থানে ছড়িয়ে ওদের বংশবিস্তারের সুবিধা করে দেয়। তিনি এও লক্ষ্য করেছেন যে পচা গাছপালার মধ্যে আর্দ্রতা ও ব্যাঙের

---

* ১৩২৬ বঙ্গাব্দের পৌষ এবং ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে যথাক্রমে 'পচা গাছপালার আলো বিকিরণ ক্ষমতা' ও 'গাছের আলো' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ছাতার মধ্যে রসাধিক্য থাকলেই আলো অধিক নির্গত হয়। ভিজা থাকার সঙ্গে আলো দেওয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

Honey Agaric জাতের ব্যাঙের ছাতাগুলো বোধ হয় mycelium-এর জীবন্ত কোষগুলোর গতিকেই আলোকিত করে থাকে। সেগুলোকে প্রায়ই পুরানো গাছের গায়ে জন্মাতে দেখা যায়। আর অন্ধকার রাত্রে আলো বিকিরণ করে থাকে। এই শ্রেণী Rhigomorphs জাতের ব্যাঙের ছাতাগুলোকে যখন কোন Hyphae আক্রমণ করে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে ফেলে, তখন তা দিব্যি আলো দিতে পারে, কিন্তু বাইরের পর্দাটা ক্রমে পুরু হয়ে উঠলে আর আলো দিতে পারে না। কিন্তু আবার এই শ্রেণীর Hymenophore জাতীয় ব্যাঙের ছাতার mycelium শত জ্যান্তো হলেও একদম আলো দিতে পারে না।

আবার শোনা যায় Gymnopus Tuberosus জাতের ব্যাঙের ছাতার বাইরের সূক্ষ্ম পর্দাটা বেশ আলো দিতে পারে। Panellus Styticus শ্রেণীর পরিণতবয়স্ক Hymenophoreগুলোও আলো দিতে পারে, কিন্তু ছোট্ট (বাচ্চা-বয়সী) গুলো আলো দিতে পারে না। Xylaria Hypoxylon জাতের ব্যাঙের ছাতার কথা শোনা যায়—যেমন তারা আপনা-আপনি জন্মায় তখন আলো বিকিরণ করতে পারে, কিন্তু যত্ন করে পুষলে আলো দেয় বা হয়ত কোন রকম আলো-দেওয়া জীবাণু এদের শরীরের ভিতর বসবাস করে অমন সুন্দর আলোর লহর ফুটিয়ে তোলে।

Monadelphus Illudeus জাতের একরকম প্রকাণ্ড, কমলারঙের, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতাই বোধহয় সবচেয়ে সুন্দর উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করতে পারে। ওদেশে ওগুলোকে সাধারণত লোকে "Jack-my-lantern" বলে থাকে। ওরা ইউনাইটেড স্টেটের পূর্বাংশে পুরানো মরা গাছের ওপর দলে দলে সুন্দর সুন্দর গোছায় গোছায় ফুটে থাকে। কোন-কোনটার টুপির ব্যাস ৬ ইঞ্চির ওপরও হয়ে থাকে। একজন কৃষক ওহিওতে অমনি আলো-দেওয়া একটা প্রকাণ্ড ব্যাঙের ছাতা দেখেছিল—সেটার টুপির বেড় হবে প্রায় ৮ ইঞ্চির ওপর; ডাঁটাটা প্রায় পনর ইঞ্চি লম্বা।

প্রাণী-জগতের এই উত্তাপশূন্য আলোক দেওয়ার ব্যাপারটার সম্বন্ধে অনেকেই অনেকদিন ধরে অনেক কথা শুনে আসছে। তা থেকেই হয়ত অনেক বিষয় দেখে অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও এ সম্বন্ধে ঢের জানবার বাকী। গভীর সমুদ্রের আলো-দেওয়া মাছ, অন্ধকার রাতে জাহাজের পাশে সমুদ্রের ঢেউ-এর ওপর সুন্দর, ঠাণ্ডা অলো খেলা, জোনাকীর বাতি, পচামাছ, পচা কপি প্রভৃতির মধ্যে জ্যান্ত আলোর ঝিকিমিকি;—এসব হয়ত অনেকেই অবাক চোখে তাকিয়ে

দেখেছে ; কিন্তু কেউই সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন করে এদের দ্বারা মানুষের কাজের উপযোগী কোন কোন জিনিস গড়ে তুলতে পারেননি। Molisch সাহেব খনি এবং বারুদখানার জন্য আলো দেওয়া বীজাণুগুলো নিয়ে একরকমের উত্তাপশূন্য আলো তৈরি করেছিলেন বটে, কিন্তু তাতে একটা উপকার হয়নি। তবে মানুষের বুদ্ধি যে ভাবে হুহু করে জ্ঞানান্বেষণে ছুটেছে, তাতে বোধহয় শীঘ্রই এ ব্যাপারটারও একটা কিনারা হয়ে যেতে পারে।

(প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩২৭)

গাছের আলো

আমার লিখিত "পচা গাছপালার আলো বিকিরণ করবার ক্ষমতা"র কারণ অনুসন্ধানের উত্তরে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় গত বৈশাখের "প্রবাসী"তে আরও অনেকগুলি নতুন খবর দিয়েছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রকৃত রাসায়নিক তথ্যটা 'যে তিমিরে সে তিমিরেই' রয়ে গেছে। Encyclopoediaতে Phosphorescent Plant সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে, কিন্তু নাই কেবল— Fungi জাতের গাছ কি খেয়ে অমন সুন্দর আলো দিতে পারে—সে সূক্ষ্ম রাসায়নিক তথ্যটা। সুরেনবাবু যে কয়জনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, তাঁরা আলো-দেওয়া Fungus পচাগাছে জন্মায়, এ পর্যন্তই আলোর কারণ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু Fungusও তো বৃক্ষশ্রেণীভুক্ত? ওরা কেন এমন সুন্দর আলো বিকিরণ করতে পারে, অন্য গাছেরা কেন পারে না, সেটার কারণ নির্দেশ করেন নি। Fungusগুলো কি কি জিনিস ওসব পচা কাঠের শরীর থেকে সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে আর অমন সুন্দর ঝক্‌ঝকে আলো দিতে পারে? সে জিনিসগুলোর খবর পেলেই ত আলোজগতের দু'একটা সম্পদ বাড়তে পারে হয় ত। আর ওরা যখন সেই উপাদানগুলো অন্য কোথাও না পেয়ে খালি পচা গাছপালার মধ্যেই পায়, তখন তো বোঝা যায় হয় পচা জিনিসগুলোর মধ্যেই আরেকটি উপাদান উৎপন্ন হয় অথবা তারা অন্য কোথাও যা সংগ্রহ করে। আর এ প্রকারের আলো যদি গাছের নিজস্বই হয়ে থাকে (Fungusই হউক আর যা-ই হউক, গাছ তো বটে), তবে অন্যান্য গাছে, লুথার বার্বাঙ্কের প্রণালী অনুসরণ করে, এ গুণটা পরিচালিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। বিশেষত যখন Fungus-এর চেয়ে আরও উচ্চশ্রেণীর আলো-দেওয়া গাছের কথা শুনেছি। গত মাঘ মাসের "প্রবাসী"তে এসম্বন্ধে আমি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের দু-একটি গাছের কথা পাঠকবর্গকে জানিয়েছিলাম। তার আগের মাসের "প্রবাসী"তে দক্ষিণ-আমেরিকার আলো-দেওয়া গাছ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। আমাদের পুরাণাদিতে মৃতসঞ্জীবনী লতা ও বিশল্যকরণী প্রভৃতি গাছগাছড়ার আলো বিকিরণ করবার কথা উল্লেখ আছে।

এখন একটা কথা হচ্ছে এই যে, Phosphorescence বলতে অনেকেই কেঁচোর আলো, জোনাকীর আলো, চিংড়ির আলো, নূনের আলো ও গাছের আলো প্রভৃতি সব রকমের আলোকেই এককোঠায় ফেলতে চান—প্রকৃত প্রস্তাবে এসকল আলোর মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কিনা? যদি থাকে—সেটা কি?

সুরেনবাবু যে কয়টি আলোর বিষয় লিখেছেন, সকলগুলিই যেন নিরপেক্ষ ভাবে আলো দিতে পারে বলে বোধ হয়। কিন্তু আমি যতগুলি আলো দেখেছি—কেবল ব্যাঙের ছাতার আলো ছাড়া আর সবগুলিই আপনা-আপনি জ্বলতে পারে না; তাদের গায়ে জল ঢেলে দিলে কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আলো বিকিরণ করতে থাকে। এখন আবার অনুসন্ধানে দেখতে পাওয়া গেলেও যে, জল দিলেই সব আলো দৃষ্টিগোচর হয় না;—জল দেওয়ার খানিক পরে জঙ্গলগুলোকে বা পাতা-লতাগুলিকে খুব ঘাঁটাঘাঁটি না করলে সব গাছের আলো দেখা যায় না, খুব ক্ষীণ আলোর রেখা দু-একটি দেখা যায় মাত্র। খুব ঘাঁটলেই একেবারে সমস্ত স্থান উজ্জ্বল আলোতে পরিণত হয়। কাঁটাগুলি বা পাতাগুলি একদম পচা, নয় মরে দিনকয়েক পর শুকালে যে অবস্থা হয় অধিকাংশ পাতাগুলি সেরকমের হওয়া চাই। আবার কতগুলি জ্যান্ত ঘাসের পুরানো ডাঁটাগুলিও খুব সুন্দর আলো দেয়—ওই রকমের কতগুলি জ্যান্ত ঘাস আমি ডক্টর পি. সি. রায়কে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলাম। একটা গাছের খুব লম্বা একটা লাঠির মত মরা শিকড় মাটির নীচে পাই, সেটার এত আলো, যে, বাতির কাছে নিলেও একটা ফিকে বা হাল্কা উজ্জ্বল সবুজ রঙের আলো দিচ্ছিল। সেটার বাইরে যেমনি উজ্জ্বল আলো, ভিতর ভেঙ্গে দেখি, ভিতরেও সর্বত্র তেমনি দিব্যি আলো। আমি কতগুলো শুকনো পাতা ও কাটী ওইসব জঞ্জালের ভেতর কয়েকদিন ফেলে রেখেছিলাম, সবগুলো আলো দেওয়ার ক্ষমতা পায় নি, কতগুলি সুন্দর আলো দিয়েছিল। একটা আলো দেওয়া আমপাতাকে একদিন রোদে শুকিয়ে আবার সেই মাটির উপর দিন দশেক ফেলে রাখার পর (অবশ্য জল দিতে হয়েছিল রোজ) এনে দেখি, এবার পূর্বের চেয়ে ১০ গুণ বেশী জোরালো হয়ে গেছে, প্রায় তিন হাত জলের নীচে থেকেও দেখা যায়। কিন্তু ঘরে চীনাবাসনে রেখে যেটায় জল দিয়েছিলাম ক্রমে ক্রমে সেটার আলো ৫।৭ দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। অনুসন্ধানে এ জাতীয় আলোর আরও অনেক নতুন তথ্য জানা যেতে পারে, যদি কেউ কষ্ট স্বীকার করে চেষ্টা করেন।

উত্তাপবিহীন আরও কতরকমের আলো যে দুনিয়াতে আছে, তার বোধহয় ইয়ত্তা নেই, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিটা এখনও ততদূর পৌঁছায় নি যাতে তারা উত্তাপ ও আলোকের সম্বন্ধটা বিচ্ছিন্ন করতে পারে।

(প্রবাসী, আষাঢ়, ১৩২৭)

ব্যাঙের ছাতা

****
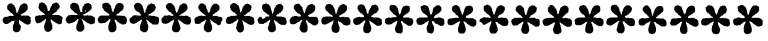
আজকাল পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশেই ব্যাঙের ছাতা বা 'মাশরুম' উপাদেয় খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপান প্রভৃতি দেশে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতার চাষ হয়ে থাকে এবং শুকনো অবস্থায় প্রচুর পরিমাণে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিক্রয়ের জন্য রপ্তানি হয়ে থাকে। আমাদের দেশেও অনেকে ব্যাঙের ছাতা অতি উপাদেয় বোধে আহার করে থাকে। চীনা হোটেলের 'মাশরুম চাউ' অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। এই দেশীয় হোটেল রেস্তোরাঁতে সাধারণত বিদেশ থেকে আনীত শুকনো ব্যাঙের ছাতাই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের লোকেরা অযত্ন-বর্ধিত ব্যাঙের ছাতাই তরকারি কিংবা মাংসের মত রান্না করে খেয়ে থাকে; কেউ কেউ ভেজে খায়।

এদেশে বহু প্রকারের ব্যাঙের ছাতা দেখতে পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশই অখাদ্য বা বিষাক্ত। কাজেই অনেকের ইচ্ছা থাকলেও বিষাক্ত অবিষাক্ত নির্ধারণ করতে না পারায়, ভাল হোটেল-রেস্তোরাঁ ছাড়া অযত্নবর্ধিত ছাতা খেতে ভরসা পান না! যে সব ছাতার গায়ে বিভিন্ন রকমের রঙ দেখতে পাওয়া যায় অথবা যাদের গলার কাছে বাটির মত বেষ্টনী থাকে অথবা যাদের ছাতা জালের মত ছিদ্রযুক্ত এবং দুর্গন্ধময় সেগুলিই বিষাক্ত থাকে। এতদ্ব্যতীত বিষাক্ত ছাতাগুলি সাধারণত অপলকা-গোছের হয় এবং কারও ডাঁটার ভিতরটা ফাঁপা হয়ে থাকে. সামান্য একটু আঘাতেই ভেঙে যায়। আমাদের দেশীয় অধিকাংশ সুখাদ্য ছাতাগুলির রঙ দুধের মত সাদা হয়। ডাঁটা ও ছাতা কতকটা রবারের মত স্থিতিস্থাপক। ডাঁটার ভিতরটা সম্পূর্ণ নিরেট। অনেক ক্ষেত্রেই আঁশ দেখতে পাওয়া যায় না। অবশ্য কোন কোন জাতীয় সুখাদ্য ছাতার আঁশ সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। আঁশশূন্য ছাতাই খেতে অধিকতর সুস্বাদু। আমাদের দেশে খড়ের গাদায়, গাছের গুঁড়ি, উইয়ের ঢিবি এবং স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার স্থানের মাটিতে বিভিন্ন সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা জন্মে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতাকে এদেশের লোকে ছাতু, কোঁড়, কোঁড়ক, পাতাল-ফোঁড়, ভুঁইফোঁড়, ভুঁই-চম্পা, ওল, আঁধার-মাণিক বা আদার-মাণিক, ভুঁই-পদ্ম, দুর্গা-ছাতু, কাঠ-ছাতু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকে। সাধারণ নাম ব্যাঙের ছাতা বা ছাতু। (ব্যাঙের ছাতা নাম কেন হল তা বলা দুষ্কর। সাধারণত একটা প্রচলিত ধারণা এই যে, ব্যাঙ এর তলায় আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে; কিন্তু এর মূলে কোন

সত্য নেই)। এদের মধ্যে ভুঁই-পদ্ম ও ভুঁই-চম্পা নামক ছাতা দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমনি সুস্বাদু।

আমাদের দেশীয় সুস্বাদু ব্যাঙের ছাতার মধ্যে ভুঁই-পদ্ম নামক ছাতাই আকারে সর্বাপেক্ষা বড় হয়। এদের ছাতার ব্যাস ৬ ইঞ্চি থেকে ৮।৯ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। উপরের দিকে ছাতার মধ্যদেশ সামান্য একটু নীচু ও রঙ দুধের মত সাদা, ডাঁটা দুই ইঞ্চি, আড়াই ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। প্রত্যেক ব্যাঙের ছাতারই নিম্নভাগে ডাঁটা থেকে ছাতার প্রান্তদেশ পর্যন্ত বইয়ের পাতার মত ভাঁজে ভাঁজে কতকগুলি পাতলা পর্দা থাকে। ভুঁই-পদ্মের নিম্নদেশের এই পর্দাগুলি বাইরের দিকে বাঁকানো। এরা ভিজে মাটির উপর আলাদা ভাবে কাছাকাছি ফুটে থাকে।

ভুঁই-চম্পা নামক ছাতাও দেখতে দুগ্ধ-ধবল এবং খেতে সুস্বাদু। এরা পুরানো গাছের গুঁড়ির কাছে মাটিতে একসঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে ফুটে থাকে। ছাতার উপরি-ভাগ ডিমের ন্যায় গোলাকার, ডাঁটাগুলি দেড় ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। ছাতার ব্যাস দুই ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চির বেশী হয় না। খড়ের গাদার পাশেও এই জাতীয় অপেক্ষাকৃত বড় এক প্রকার ছাতা মাঝে মাঝে জন্মাতে দেখা যায়। এদেরকে সাধারণত খড়-ছাতু বলে।

দুর্গা-ছাতুর ডাঁটা আড়াই ইঞ্চি থেকে তিন-চার ইঞ্চি লম্বা হয়। ছাতা থালার মত প্রায় সমতল, গোলাকার, প্রান্তদেশ প্রায়ই ছিঁড়ে যায় এবং বিভিন্ন আকারের তারকা চিহ্নের মত দেখায়। এদের রঙ একটু লালচে সাদা। ছাতার ব্যাস এক ইঞ্চি-দেড় ইঞ্চির বেশী হয় না। আর এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গা-ছাতু দেখতে পাওয়া যায়। এদের ছাতা আধ ইঞ্চির বেশি বড় হয় না। এরা যখন মাটির উপর দলে দলে ফুটে থাকে তখন ভারী সুন্দর দেখায়। পূর্বাঞ্চলের লোকেরা এগুলিকে ওল, ভুঁই-তারা বা আঁধার-মাণিক বলে থাকে। আর এক রকম ছোট ছোট দুর্গা-ছাতু প্রায়ই খড়ের গাদার আশে-পাশে ফুটে থাকে। এদের ডাঁটাগুলি সরল হয় না, এঁকে-বেঁকে উঠে থাকে। এই ছাতুও খেতেও মন্দ নয়।

গাছপালায় আবৃত বনজঙ্গলের অন্ধকার স্থানে দুধের মত সাদা, কোণাকার টুপিওয়ালা এক প্রকার ছাতা জন্মাতে দেখা যায়। এদের ডাঁটাগুলিও সম্পূর্ণ সরল নয়, ছাতার মাথার কাছে খুব পাতলা একটি বেষ্টনী থাকে। এদেরকে সাধারণত ভুঁই-ছাতু বলে। অনেকে এদিগকে কলাপাতায় করে ভেজে খেয়ে থাকে।

উইয়ের ঢিবির মধ্যে সরু বোঁটাওয়ালা, ঈষৎ ধূসর রঙের এক প্রকার ছাতা জন্মে। এদের টুপিও কোণাকার ঠিক আধখানা কুলের মত দেখতে। এদের ডাঁটা আধ ইঞ্চিরও বেশি লম্বা হয়ে থাকে। এদিগকে পাতাল-ফোঁড় বলা হয়। পাতাল-ফোঁড় একটু শক্ত লাগলেও খেতে মন্দ নয়।

পচা কাঠের গায়ে অনেক সময় একসঙ্গে অনেকগুলি করে সাদা সাদা গোলাকার ফুল ফুটতে দেখা যায়। ফুলগুলির বেড় দুই ইঞ্চি আড়াই ইঞ্চি পর্যন্ত হয়, ফুলের মধ্যস্থলে গভীর গর্ত, বোঁটা ছোট ও বাঁকানো। এদের আঁশ খুব শক্ত, কাজেই সহজে ভেঙে বা ছিঁড়ে যায় না। এদিগকে কাঠ-ছাতু বলে। এদেশে কয়েক রকমের কাঠ-ছাতু দেখতে পাওয়া যায়। যে-সব কাঠ মাটিতে পড়ে পচে, তার গায়ে কলকে ফুলের মত প্রায় তিন-চার ইঞ্চি গোলাকার, বেশ বড় বড় এক শ্রেণীর ছাতা ফুটতে দেখা যায়। এদের ডাঁটাগুলি প্রায়ই ধনুকের আকারে বেঁকে থাকে। এদিগকে কাঠ-চম্পা, আবার কেউ কেউ কাঠ-ছাতু নামেও অভিহিত করে থাকে। কাঠ-ছাতুও বিষাক্ত নয়। তবে উপরিউক্ত ছাতুর মত তত সুস্বাদু নয়। সমস্ত রকমের ছাতাই কুঁড়ি অবস্থায় অথবা ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই খাওয়া উচিত। নচেৎ, ফুটেই এক দিন দুই দিন থাকলেই ছাতার নীচের দিকে পর্দার ভাঁজে অতি সূক্ষ্ম পোকা জন্মায়। বিভিন্ন ছাতার গায়ে লাল, কালো, সাদা বিভিন্ন রঙের পোকা দেখতে পাওয়া যায়।

সাধারণ ভোজ্য বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয় বলে আমাদের দেশে আজও ব্যাঙের ছাতার প্রচলন হয় নি। অবশ্য কেউ কেউ শখ করে অল্পবিস্তর চাষ করে থাকেন। ব্যাঙের ছাতা সাধারণত অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে স্থানেই জন্মায়। চাষ করতে হলে হাওয়া খেলতে পারে এরূপ কোন স্যাঁতসেঁতে স্থান নির্বাচন করা প্রয়োজন। যদিও এরা অযত্নে যেখানে-সেখানে জন্মে থাকে তথাপি চাষ করতে হলে বিশেষ যত্ন দরকার নচেৎ কোন ফসলই উৎপন্ন হবে না। প্রায় দু-হাত চওড়া আট-দশ ইঞ্চি খাড়াই পুরানো কাঠের তৈরি ট্রে'র মধ্যে গোবর বা ঘোড়ার নাদ মিশ্রিত শুষ্ক সার মাটি চেপে বসিয়ে সামান্য জল দিয়ে ভিজতে দিতে হয়। প্রায় সাত-আট ইঞ্চি পুরু করে মাটি বসাতে হবে। মাটি কম হলে উত্তাপের সমতা রক্ষিত হবে না, আবার বেশি মাটি দিলেও উত্তাপ প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়বে। এভাবে ক্ষেত্র তৈরি হলে তাতে ছত্র-সূত্র বা ব্যাঙের ছাতার বীজ বসিয়ে দিতে হয়। যেখানে ব্যাঙের ছাতা গজায় সেখান থেকে সূত্রসমন্বিত খানিকটা অংশ অতি সাবধানে তুলে এনে বসিয়ে দিলেও চলতে পারে অথবা বিদেশ থেকে আনীত বীজ-সূত্র-সমন্বিত ঘাসের কেক ব্যবহৃত হতে পারে। বীজ প্রোথিত করবার পর প্রথম ফসল জন্মাতে প্রায় তিন-চার মাস সময় লেগে থাকে। বীজ পুঁতবার কিছুদিন পরে যখন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাদা সূতার মত পদার্থ সমস্ত মাটির উপর ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাবে তখন তার উপর প্রায় এক ইঞ্চি পুরু করে খুব মিহি সার-মাটি ছড়িয়ে দিতে হয়। এখন থেকে নজর রাখতে হবে যেন মাটি একেবারে শুষ্ক হয়ে না যায়। মাটি একটু স্যাঁতসেঁতে রাখবার জন্য ঘরের মধ্যে বড় পাত্রে করে জল রেখে দিলেও চলতে পারে। স্টোভ বা অন্য আলোর সাহায্যে ঘরের উত্তাপ প্রায় ৬০ ডিগ্রি পর্যন্ত রাখতে পারলে ভাল হয় চাষ করলেও ব্যাঙের ছাতা সবগুলিই

একযোগে জন্মায় না। পর পর দফায় দফায় জন্মে থাকে। ছাতা দেখা দিলেই সামান্য জল দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দেওয়া দরকার। প্রথম বারের ফসল উঠে গেলে সেই জমির উপরই আবার কিছু সার-মাটি বসিয়ে দিলে, দু-তিন মাস পরে আবার নূতন ফসল পাওয়া যাবে।

(প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৩)

সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা

****
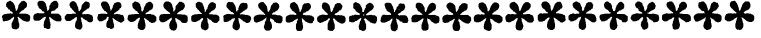
কয়েক জাতীয় ব্যাঙের জাতীয় ছাতা মাছ-মাংসের মতই উপাদেয় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে মনে করতে পারে—যথেষ্ট খাদ্য-মূল্য না থাকলে যত উপাদেয়ই হোক না কেন, নতুন করে কোন পদার্থকে আমাদের খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন কি? কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার, স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে ভিটামিন-প্রোটিনের প্রয়োজন থাকলেও বেছে বেছে কেবল ভিটামিন-প্রোটিন খেলেই চলে না; উদরপূর্তির জন্যে, খাদ্যমূল্য কম এমন অনেক পদার্থের প্রয়োজন। ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট এবং নাইট্রোজেন-ঘটিত যত কিছু পদার্থই আমরা উদরস্থ করি না কেন, পরিপাকযন্ত্র যথাযথ সক্রিয় অবস্থায় না থাকলে কিছুতেই আমাদের স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটতে পারে না। এ কারণেই যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন-প্রোটিন সেবন করেও অনেকে রোগের প্রভাবমুক্ত হতে পারে না, অনেকে আবার পানি-পান্তা উদরস্থ করেই সুস্থ শরীরে, সুস্থ মনে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। খাদ্যদ্রব্য মুখরোচক হলে পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যকারী রসসমূহ প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়ে থাকে। কাজেই মুখরোচক পদার্থ সহযোগে আমাদের কার্বোহাইড্রেট-প্রধান খাদ্যদ্রব্যকে যথাসাধ্য উপাদেয় করা প্রয়োজন। এ হিসাবে খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতা একটা অতি উপাদেয় পদার্থ। কেবল উপাদেয়ই নয়, এতে প্রচুর পরিমাণ নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থও রয়েছে। উপাদেয় খাদ্য হিসাবে এগুলির সঙ্গে আমাদের দেশের অনেকেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরিচয় থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশে কেউ কেউ কোন কালে এগুলিকে চাষ-আবাদ করে জন্মাবার ব্যবস্থা করেনি। অথচ অনেককাল থেকেই ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ব্যাপকভাবে ব্যাঙের ছাতার চাষ-আবাদ হয়ে আসছে। কলকাতার বড় বড় হোটেলগুলিতে বিদেশ থেকে আমদানী সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। চীনা রেস্তোরাঁগুলিতে অনেকেই হয়তো রসনাতৃপ্তিকর মাশরুম চাউ আস্বাদন করে থাকবে। কলকাতার প্রায় প্রত্যেকটি বাজারেই মাঝে মাঝে এ জিনিস অল্প পরিমাণে আমদানি হয়ে থাকে। পাড়াগাঁয়ের লোকেরাও এ জিনিসগুলিকে উপাদেয় খাদ্য হিসাবেই ব্যবহার করে।

আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার স্থানে পুরনো গাছের গুঁড়ি বা পচা খড়কুটার মধ্যে ছোট বড় অনেক রকমের ব্যাঙের ছাতা গজাতে দেখা যায়। বিভিন্ন জাতের কত যে রকমারি ব্যাঙের ছাতা আছে তার সংখ্যা নির্ণয় করা

দুষ্কর। ব্যাঙের ছাতা যে কেবল মাটিতেই জন্মায় তা নয়। গাছের উপরে শুকনো ডালপালার গায়ে ব্রাকেটের মত অথবা কানের মত তক্তকে বিভিন্ন জাতের ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে থাকে। চল্‌তি কথায় এগুলিকে বলে—গাছের কান। তাছাড়া স্যাঁতসেঁতে চামড়া, পচা ফলমূল, কীটপতঙ্গের মৃতদেহ, এমন কি জলের মধ্যে পর্যন্ত বিভিন্ন জাতের ব্যাঙের ছাতা বংশবিস্তার করতে কসুর করে না। আমরা যাকে 'ছাতাধরা' বলি সেগুলিও একরকমের সূক্ষ্ম ব্যাঙের ছাতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যাহোক আমাদের বক্তব্য হচ্ছে –ঠিক ছাতার মত দেখতে অপেক্ষাকৃত বড় বড় ব্যাঙের ছাতাগুলিকে নিয়ে। খড়ের গাদায়, পচা গাছের গুঁড়িতে অথবা মাটির উপরে ছাতার মত যে সকল পদার্থ জন্মায় সেগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে ; যেমন—বিষাক্ত, দুষ্পাচ্য বা অখাদ্য এবং খাদ্য। দুর্গন্ধযুক্ত ফাঁপা, ভঙ্গপ্রবণ ব্যাঙের ছাতাগুলি সাধারণতঃ বিষাক্ত হয়ে থাকে। তাছাড়া কালো, গাঢ় ধূসর এবং লাল ছিটওয়ালা ছাতাগুলিও কম বেশী বিষাক্ত হতে পারে। হল্‌দে, সাদা, গোলাপী এবং চামড়ার মত তক্‌তকে ছাতাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বিষাক্ত না হলেও দুষ্পাচ্য এবং অখাদ্য। ধবধবে সাদা, কোমল অথচ নমনীয় অর্থাৎ সহজেই ভেঙে যায় না এবং আঁশওয়ালা ছাতাগুলিই খাদ্যোপযোগী। অবশ্য ধূসর এবং গোলাপী আভাযুক্ত কতকগুলি ব্যাঙের ছাতা খেতে বেশ সুস্বাদু। পূর্বেই বলেছি, আমাদের দেশে অগুন্তি রকমারি ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। কেবল বর্ণনা থেকেই আকৃতি ও লক্ষণ মিলিয়ে খাদ্যাখাদ্য বিচার করা সম্ভব হয় না। তাতে ভুলচুকে বিষাক্ত ছাতা ব্যবহার করাও অসম্ভব নয়। এ কারণেই ভুল করে ব্যাঙের ছাতা খেয়ে প্রতি বছরই কিছু কিছু রোগী কলকাতার হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসার জন্যে এসে থাকে। কাজেই যারা খেয়েছে অথবা যারা সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত প্রথমতঃ তাদের দিয়েই চিনিয়ে নেওয়া উচিত।

অযত্নবর্ধিত অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় উৎপন্ন সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতগুলি সাধারণত একটু অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে জায়গার খানিকটা জুড়ে একই সময়ে আত্মপ্রকাশ করে ; বিচ্ছিন্ন বা এককভাবে এদের এখানে-সেখানে জন্মাতে দেখা যায় না। কোথাও কিছু নেই, অকস্মাৎ দেখা গেল—বোটার মাথায় একটা বোতামের মত পদার্থ নিয়ে কতকগুলি জিনিস মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেগুলি দ্রুতগতিতে বড় হয়ে যায় এবং ফুটে গিয়ে কেউ ছাতা, কেউ ফুল আবার কেউ বা মন্দিরের সূক্ষ্ম চূড়ার আকার ধারণ করে ; কিন্তু দু-এক দিনের মধ্যেই শুকিয়ে নেতিয়ে যায়। এদের স্পোর বা বীজরেণু থেকে সূক্ষ্ম সূতার জালের মত এক রকম পদার্থ মাটি বা কাঠ-খড়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলিকে বলা হয় ছত্রাক-সূত্র। এই সূত্র-জালের প্রত্যেকটি গ্রন্থি থেকে এক-একটি ব্যাঙের ছাতা বাইরে গজিয়ে ওঠে। এগুলি হলো

বীজাধার। ছাতার নীচের দিকে অগণিত স্পোর বা বীজরেণু পরিপক্ক হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। যে খরকুটা বা মাটিতে ব্যাঙের ছাতা জন্মেছে তার খানিকটা তুলে নিয়ে অল্প আলোকিত স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার স্থানে পচা কাঠ-খড় মিশ্রিত মাটির মধ্যে বসিয়ে দিলে ইচ্ছানুযায়ী প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা উৎপাদন করা যেতে পারে।

আমাদের দেশে উইয়ের ঢিবি এবং খড়ের গাদার মধ্যে কয়েক রকমের খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতা জন্মাতে দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা যেগুলিকে বলে ভুঁইফোঁড়: কেউ বলে ওল, কেউ বলে ছাতু, আবার কেউ বলে কোঁকড় বা কোঁড়। পাড়াগাঁয়ে এগুলি সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পও প্রচলিত আছে। উইপোকারা তাদের ঢিবির মধ্যে একরকম ছত্রাক-সূত্র সংগ্রহ করে রাখে -সেগুলি থেকেই বোধহয় মাঝে মাঝে এই ভুঁইফোঁড় বেরিয়ে আসে। এদের ডাঁটাগুলি হয় অসম্ভব লম্বা এবং সরু। এক-একটা ঢিবির মধ্যে একই সময়ে অকস্মাৎ শতাধিক ছত্রাক আত্মপ্রকাশ করে। স্থানীয় লোকেরা এগুলিকে বিবিধ মসলা সহযোগে মাংসের মত রান্না করে খায়। খড়ের গাদার মধ্যে ভুঁইফোঁড় অপেক্ষা খানিকটা সরু এবং কিঞ্চিৎ লতানে একরকম সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা প্রায়ই জন্মাতে দেখা যায়। এগুলি বলা হয় দুর্গা ছাতু। পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতাগুলি সাধারণত ছাতু নামে পরিচিত। ছত্রাক থেকে ছাতা এবং বোধহয় ছাতা থেকে ছাতু হয়েছে। অবশ্য কোন কোন স্থানে কোঁকড় বা কোঁড়ও বলা হয়। কলকাতার আপেশাশে পাড়াগাঁয়ে খড়ের গাদা বা আবর্জনাস্তূপে বেশ বড় বড় সুদৃশ্য একরকম সুখাদ্য ব্যাঙের ছাতা জন্মায়। এগুলির ছাতা হয় খুব পুরু আর দেখতে বেশ ধবধবে সাদা। এই ছাতাগুলি সাধারণত খড়-ছাতু নামে পরিচিত। ঢাকুরিয়া অঞ্চলে নারকেল, তাল প্রভৃতি পুরনো গাছের গুঁড়িতে একজাতের সুখাদ্য বড় বড় ব্যাঙের ছাতা জন্মে যখন এগুলির কুঁড়ি বের হয় এখন মনে হয় যেন গাছের গোড়ায় ধবধবে সাদা বড় বড় টেনিস বল আটকে রয়েছে। ফোটবার পর এদের কোন কোনটার ছাতার ব্যাসের মাপ ৮।১০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলো খেতে খুবই উপাদেয়। বিশেষত ডিমের বেসন সহযোগে কাটলেট খুবই মুখরোচক। এগুলি সাধারণত ভুঁইপদ্ম নামে পরিচিত। পুরনো গাছের গায়ে কলকে ফুলের মত একরকম ব্যাঙের ছাতা জন্মে। সেগুলিকে অনেকে বলে খইরি বা কাঠ-চম্পা। এগুলি খাওয়া যায় বটে—কিন্তু তত সুস্বাদু নয়; বিশেষত সিদ্ধ করবার পর তন্তুগুলি অনেকটা রবারের মত হয়ে যায়। কতকটা কলমি ফুলের মত—একটু কালচে সাদা, গাছের গায়ে আর এক রকমের ব্যাঙের ছাতা পাওয়া যায়। এগুলিকে বলা হয় কাঠ-ছাতু। এগুলিও খাদ্যোপযোগী বটে; কিন্তু তত সুস্বাদু নয়। এ ছাড়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় আরও কয়েক জাতের কাঠ-ছাতু পল্লী অঞ্চলে জন্মাতে দেখা যায়। বড় বড় ছত্রাক বাদেও ভুঁইচম্পা নামে পরিচিত কয়েক জাতের ক্ষুদ্রকায় খাদ্যোপযোগী ব্যাঙের ছাতা

যেখানে-সেখানে জন্মে থাকে। ব্যাঙের ছাতা সংগ্রহ করে তার উপরকার আঁশ ফেলে দিয়ে গরম জলে খানিকটা সিদ্ধ করে নিলেই মাংসের মত তল্‌তলে হয়ে যায়। এ অবস্থায় ছাতাটার গায়ে কিছু হড়হড়ে পদার্থ থেকে যেতে পারে; কিন্তু তাতে কোন অসুবিধার কারণ নেই। বেশ করে জলে ধুয়ে তারপর সেগুলিকে মাংসের মত রান্না করা যেতে পারে। উপযুক্ত বেশন সহযোগে ফ্রাই, কাটলেটের মতও তৈরি করা যেতে পারে।

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ডিসেম্বর, ১৯৫২)

মানুষ কি অতঃপর ঘাস খাবে ?
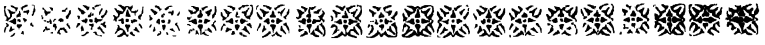
কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও এর মধ্যে কিছুমাত্র মিথ্যা বা অতিশয়োক্তি নেই। কিন্তু সেজন্য কেউ যেন মনে না করে যে, ঘাস খাবার জন্য গরু, ঘোড়ার মত অতঃপর আমাদের মাঠে চরে বেড়াতে হবে। অক্লান্ত বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টায় ফলে এমন একটা অদ্ভুত অথচ সহজলভ্য জিনিসের সন্ধান পাওয়া গেছে যার সাহায্যে বর্তমান খাদ্যসমস্যা সমাধানের পথ বহুলাংশে সুগম হয়ে উঠবে বলে মনে হয়। জিনিসটা আর কিছুই নয় —পশুর খাদ্য সাধারণ ঘাস! ঘাস থেকে প্রোটিন সিন্থেসিসের কথা হচ্ছে না, সাধারণ ঘাসকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় মানুষের খাদ্যে রূপান্তরিত করবার কথাই বলছি। বিশেষ প্রক্রিয়ায় শোধিত হবার পর ঘাসকে ঘাসের মত রেখেই হোক অথবা চূর্ণ করেই হোক, যে কোন ভাবেই খাওয়া চলবে। অবশ্য চিরপোষিত ধারণা বশে ঘাস খাওয়াটা মানুষের পক্ষে গ্লানিকর বিবেচিত হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে ঘাস খাওয়ার ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে একেবারে অভিনব নয়। পরিমাণে অকিঞ্চিৎকর হলেও প্রায়ই আমরা বিচিত্র রকমের ঘাসজাতীয় পদার্থ উদরস্থ করে থাকি। অবশ্য সেই ঘাসকে আমরা ঘাস বলি না, বলি শাকসব্জী। কাজেই কেবল নামমাহাত্ম্যেই এই অভিনব বস্তুটা খাদ্য হিসাবে অনেকের নিকট প্রীতিপ্রদ নাও হতে পারে। সেজন্য এই খাদ্যোপযোগী ঘাসের বিজ্ঞানসম্মত নামকরণ করা হয়েছে—সেরোফিল। শীঘ্রই হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় ঘাস একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ইতিমধ্যেই আমেরিকার কোন কোন স্থানে রুটি, মাখন, দুধ, আইসক্রীম ও দুগ্ধজাত বিবিধ পদার্থে যথেষ্ট পরিমাণ ঘাস মিশ্রিত করে খাওয়ার টেবিলে ব্যবহৃত হচ্ছে। জৈব-রাসায়নিক ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক-গণের পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে যে, ঘাসজাতীয় বিভিন্ন পদার্থের কাঁচ পাতায় যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য-প্রাণ বা ভিটামিন রয়েছে। এই ভিটামিন অবিকৃত রেখে ঘাস সংশোধন করার ব্যবস্থা করতে পারলে এর দ্বারা মানুষ থেকে আরম্ভ করে পশুপক্ষী পর্যন্ত সকলেরই খাদ্যসমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে। এমন কি চিকিৎসকের ব্যবস্থামত রোগীর পথ্যরূপেও এটি ব্যবহার করা চলবে। বহুবিধ পরীক্ষার ফলে অখাদ্য ঘাস আজ সুখাদ্যে পরিণত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকে ঔৎসুক্যের সঙ্গে এই অভিনব আবিষ্কারের পরিণতি লক্ষিত হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এর অধিকতর উন্নতি পরিলক্ষিত হবে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে দুধ, শাকসব্জী এবং তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ ফলমূল

আহার করা উপযুক্ত স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অপরিহার্য। এর প্রত্যেকটি পদার্থের মধ্যেই শরীরপোষণোপযোগী বিভিন্ন বস্তু এবং তদুপরি যথেষ্ট ভিটামিন রয়েছে। কিন্তু প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সংযুক্ত উৎকৃষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে কেবল দুঃসাধ্যই নয়, সম্পূর্ণ অসম্ভব। মুষ্টিমেয় সঙ্গতিশালী লোক ছাড়া অধিকাংশ ব্যক্তিরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য যা আহার করে থাকে তা স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে পর্যাপ্ত তো নয়ই অধিকন্তু ভিটামিনের অভাব হেতু নানা প্রকার রোগোৎপত্তির কারণ হয়ে থাকে। সস্তা খাদ্যের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন পাওয়া সম্ভব নয়। আর্থিক ব্যবস্থার সমতা সাধিত হলেই যে প্রত্যেকের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিনসংযুক্ত খাদ্যসংগ্রহের সুবিধা হবে তাও বলা চলে না। মোটের উপর যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন আহরণ বা উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে না পারলে এ সমস্যার সমাধান হবে না। এমতাবস্থায় অধিকতর কার্যকরী কোন পদার্থের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ঘাসের উপর নির্ভর করতে হবে। কচি ঘাসপাতার মধ্যে শরীরপোষণাপযোগী বিবিধ খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন রয়েছে। অল্প মূল্যের খাদ্যের সঙ্গে এটি মিশ্রিত করে ব্যবহার করলে যেমন খরচও বিশেষ কিছু বাড়বে না তেমনই আবার উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিনের দরুন স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটবে। আমেরিকার মত স্থানের লোকেরাই যখন খাদ্যসমস্যায় বিব্রত হয়ে ঘাসের খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে তখন অপেক্ষাকৃত দরিদ্র দেশের অধিবাসীদের পক্ষে এই অভিনব খাদ্য যে অধিকতর সুবিধাজনক বিবেচিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। খাদ্যোপোযোগী ঘাস বাছাই করে আহরণ করা প্রয়োজন। যব, গম, বার্লি প্রভৃতি চারাগাছের গাঁট জন্মাবার পূর্বেই অর্থাৎ রোপণ করবার পর প্রায় ১৭/১৮ দিনের মধ্যেই পাতাগুলি কেটে নিতে হবে। এই সময়েই চারা গাছের পাতায় ভিটামিন জাতীয় পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। বিশেষতঃ কচি পাতায় শক্ত আঁশ না থাকায় মানুষের পক্ষে হজম করা সহজ। শক্ত আঁশযুক্ত ঘাস পাতা ঘোড়া, গরু প্রভৃতি জীবজন্তুরা হজম করতে পারলেও মানুষের পক্ষে তা দুষ্পাচ্য। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাতার আঁশও ক্রমশ শক্ত হতে থাকে এবং তদনুপাতে তার প্রোটিন, ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টিকর পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পায়। ঘাসের কচি পাতা সংগ্রহ করে তাকে খাদ্যোপযোগী করবার জন্য কয়েকটি বিশেষ উপায় অবলম্বন করতে হয়। ঘাসের উৎপাদনকারী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান যন্ত্রসাহায্যে জমি থেকে ঘাস কেটে এনে সেগুলিকে কাটাই যন্ত্রে ফেলে ইচ্ছামত কুচিয়ে নেন। পরে কুচানো ঘাসগুলিকে বিরাট একটা ঘূর্ণায়মান ড্রামের মধ্যে পুরে হঠাৎ উৎপাদিত উচ্চ তাপে অতি দ্রুত শুষ্ক করা হয়। শুষ্ক হবার পর পরিষ্কার করে প্রয়োজন মত ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্যাকিং হবার পর বাজারে প্রেরিত হয়। ইতিমধ্যে অবশ্য সবুজ রং বর্জন করে গুঁড়া করবার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। ঔষধ ও পথ্যাদির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ঘাসগুলিকে শুষ্ক করবার পর চূর্ণ করে, বায়ু প্রবেশ করতে না পারে এরূপ আবদ্ধ কৌটায়

নাইট্রোজেন গ্যাসের মধ্যে রাখা হয়। এই উপায়ে ঘাসের ভিটামিনকে অবিকৃত-ভাবে বহু দিন স্থায়ী রাখতে পারা যায়। আমেরিকার অণ্টেরিও ও টেক্সাস্ প্রভৃতি স্থানে পূর্ণোদ্যমে এই ঘাসের খাদ্য উৎপাদন চলছে। জমিতে একবার বীজ বুনে তা থেকে কয়েক বার ঘাস সংগ্রহ করা যেতে পারে। এতে যথেষ্ট ঘাসও সংগ্রহ হয় অথচ ফসল পেতেও অসুবিধা ঘটে না। চারা গাছগুলি গজাবার ১৬/১৭ দিন পরে একবার কেটে নেওয়া হলে আবার নূতন পাতা গজাতে থাকে। আবার সেগুলিকেও কেটে নেওয়া হয়। বার তিনেক এই ভাবে কেটে নেওয়ার পর গাছগুলিকে বাড়তে দেওয়া হয়। তখন সে গাছগুলি বড় হয়ে শস্য উৎপাদন করতে পারে।

ভিটামিন সম্পর্কিত স্বাস্থ্যোন্নতি বিষয়ক নূতন কোন আবিষ্কার সম্বন্ধে সাধারণত অনেকেরই একটা সন্দেহের ভাব থাকে যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা সর্বতোভাবে কার্যকরী হবে কি না ? বিশেষত ভিটামিন সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘাসের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সেই সন্দেহ একটু অধিক হবারই কথা। কিন্তু যতদূর দেখা গেছে তাতে এই সন্দেহ অমূলক বলেই মনে হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, যাঁদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল তাঁরা অর্থের বিনিময়ে শরীরপোষণোপযোগী যাবতীয় ভিটামিন সংগ্রহ করতে পারেন। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ ভিটামিন সংগ্রহের উপায় নেই। অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যেই শোধিত ঘাস জন-সাধারণের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এর ফলে একমাত্র ভিটামিন ডি ছাড়া অতি সামান্য অর্থের বিনিময়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী অন্যান্য ভিটামিন সহজলভ্য হবে।

খাদ্যদ্রব্যে সবুজ রংটা সাধারণত অনেকেই পছন্দ করেন না। রাসায়নিকেরা ঘাসকে খাদ্যোপোযোগী করে তুলবার সময় এই রঙের সমস্যাও তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রুটির সঙ্গে ঘাসের গুঁড়া মিশ্রিত করবার ফলে রুটির বর্ণ হয় সবুজ। এই সবুজ রুটি অনেকের নিকট প্রীতিকর হয় না। তখন তারা ঘাস থেকে সবুজ রঙের ক্লোরোফিল কণিকাগুলি বের করে ফেলবার ব্যবস্থা করে। ক্লোরোফিল বর্জিত ঘাসের গুঁড়া দেখতে কতকটা মল্টেড্-মিল্কের মত এবং খেতেও 'মল্টেড্-মিল্কে'র মত সুস্বাদু। অধিকন্তু এতে খাদ্যপ্রাণ পদার্থের প্রাচুর্য রয়েছে। ক্লোরোফিল বর্জিত ঘাসের গুঁড়া মেশাবার ফলে সাদা রুটি সোনালী বর্ণ ধারণ করে এবং খেতেও তৃপ্তিকর।

কাজেই শীঘ্রই হয়তো এমন দিন আসতে পারে যখন ঘাসকেই আমরা অন্যতম প্রধান খাদ্যরূপে বেছে নেব। খাদ্য-সমস্যার জটিলতা দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে এই ঘাসের খাদ্য সেরোফিল হয়তো খাদ্য, অর্থ ও ভিটামিন—একাধারে এই ত্রিবিধ সমস্যার সমাধানে সমর্থ হবে—এই বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, অশেষবিধ রসনাতৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর পদার্থ থাকতে অবশেষে বৈজ্ঞানিকদের ঘাসের মত একটা অকিঞ্চিৎকর পদার্থের উপর নজর পড়ল কেন ?

ঘটনাটা কতকটা আকস্মিক। বহুবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য যেমন আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, এটিও কতকটা সেইরূপ।

প্রায় বছর-বারো পূর্বে চার্লস স্ক্যাবেল নামে জনৈক জৈব-রাসায়নিক তাঁর দুই জন সহকর্মীকে নিয়ে ডিম উৎপাদনের জন্য একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ডিম-উৎপাদন সম্পর্কিত সমুদয় কার্যই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হত। অতি সতর্কতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হলেও কিছু দিন পরে দেখা গেল — ডিম পাড়বার পর প্রায় একই সময়ে হাজার-পাঁচেক মুর্গী অসুস্থ হয়ে পড়ল। অবশেষে তাদের মৃত্যুসংখ্যা এতই বৃদ্ধি পেল যে অতঃপর আর কারবার না গুটিয়ে উপায় থাকল না। এই অবস্থায় অন্যান্য সকলে আশা ছেড়ে দিলেও স্ক্যাবেল কিন্তু কিছুতেই থামলেন না। তিনি এই মড়কের কারণ অনুসন্ধানে উঠে পড়ে লাগলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁর ধারণা হল যে, উপযুক্ত পরিমাণে শরীরের রক্তকণিকা উৎপাদক পদার্থের অভাবই এই মড়কের প্রধান কারণ। কাজেই রক্তকণিকা উৎপাদক পুষ্টিকর পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াতে পারলে, নিশ্চয়ই এই মড়ক নিবারিত হবে, অধিকন্তু ডিমের উৎকর্ষ ও উৎপাদন বৃদ্ধিও অসম্ভব নয়। উদ্ভিদের সবুজ পত্রাদির মধ্যে যে রক্তকণিকা বৃদ্ধির উপাদান রয়েছে তা বৈজ্ঞানিক-দের অজ্ঞাত নয়। স্ক্যাবেল পাখির মড়ক প্রতিরোধ কল্পে উদ্ভিদের সবুজ পত্র খাওয়াতে মনস্থ করলেন। আল্‌ফাল্‌ফা নামক ঘাসের সবুজ পত্রই এই পরীক্ষায় বিশেষ উপযোগী বলে বিবেচিত হল। পরীক্ষার ফলে কিছু দিন পরে দেখা গেল, যে মুর্গীগুলিকে খাদ্যের শতকরা দশ ভাগ পরিমিত ঘাস প্রদান করেছিলেন তাদের বিশেষ কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত না হলেও মোটামুটি তারা সুস্থ রয়েছে। কিন্তু যারা শতকরা দশ ভাগের বেশী ঘাস উদরস্থ করেছে তাদের উন্নতি তো দূরের কথা বরং পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়েছে। প্রায় দুই বৎসর ধরে মুর্গীগুলিকে প্রায় ২০ রকমের বিভিন্ন ঘাস পাতা খাইয়ে তিনি এক রকম হতাশ-ভাবেই তাঁর মতবাদ পরিত্যাগ করবার উপক্রম করছিলেন এমন সময়ে যব, ভুট্টা, বার্লি প্রভৃতি কচি গাছের সবুজ পত্র ব্যবহারের ফলে কতকগুলি মুরগীর আশ্চর্য উন্নতি লক্ষ্য করলেন। এই নূতন খাদ্য খাওয়াবার ফলে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে পাখীগুলি যে কেবল সুস্থ সবলই হয়ে উঠল তা নয়, পরন্তু অধিকসংখ্যক উৎকৃষ্ট ডিম প্রসব করতে আরম্ভ করল। এই ব্যাপারে উৎসাহিত হওয়ার পর বৎসর আবার অনুরূপ পরীক্ষা শুরু করলেন, এবারও ঠিক পূর্ব বৎসরের মতই ফল লাভ করে ঘাসের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ হলেন। কিন্তু এই সময়ে তিনি আর্থিক অনটনের দরুন বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েন। স্ত্রীপুত্র সমেত আটটি প্রাণীর উপযুক্ত আহার্য সংগ্রহ করাই কষ্টকর হয়ে উঠল। সামান্য অর্থের বিনিময়ে যে আহার্য সংগ্রহ করেন তাতে কোনরকমে উদরপূর্তি হয় বটে; কিন্তু তাতে উপযুক্ত পুষ্টিকর পদার্থ থাকে না। এই অবস্থায় এক দিন হঠাৎ তাঁর মনে হল — কচি ঘাসপাতা যদি হাঁস, মুরগীর স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটাতে পারে তবে তা মনুষ্য

শরীরেও উন্নতিসাধন করবে না কেন ? কথাটা মনে হতেই তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হলেন। ঘাসের কচিপাতা শুষ্ক করে সরে ভিজিয়ে রোজই তা পরিবারের প্রত্যেকের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে ক্রমাগত তিন বৎসর ঘাসের সাহায্যে ভিটামিনের অভাব পূর্ণ করে তিনি দেখতে পেলেন— তাঁদের প্রত্যেকেরই চমৎকার স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটেছে।

ইতিমধ্যে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। উইস্কন্সিন্ ইউনিভার্সিটির জর্জ কোহ্লার নাক একজন নবীন গবেষণারতী বিখ্যাত জৈব-রাসায়নিক প্রোফেসর হার্ট এবং ডঃ এল্ভেজেমের পরিচালনাধীনে খাদ্যতত্ত্ব সম্পর্কিত রাসায়নিক গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন। গবেষণার কাজ চলবার সময় একটি অদ্ভুত ঘটনা দেখে সে সম্বন্ধে তিনি অতিমাত্রায় কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। ঘটনাটা এই—যে ইঁদুরগুলির উপর পরীক্ষা চলছিল সেগুলিকে সারা বৎসর নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্দিষ্ট নিয়মে একই রকম নূন, জল, দুধ ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ খাদ্য হিসাবে দেওয়া হত। তথাপি কিন্তু শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে তাদের বৃদ্ধির দ্রুততা এবং শারীরিক উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হত। একমাত্র দুধ ছাড়া অন্য অন্য কোন জিনিসেই পরিবর্তন সম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই দুধও সারা বৎসর নির্দিষ্ট এক স্থানের একই জাতীয় গরু থেকে সংগৃহীত হত। অনেক আলোচনার পর স্থির হল যে, শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের দুধের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা পরীক্ষা করা হোক। ডঃ কোহ্লার এই অদ্ভুত ব্যাপারের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করবার জন্য পরীক্ষা শুরু করলেন। কিন্তু শীতকাল ও গ্রীষ্ম-কালের দুধের তুলনামূলক পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ বলে তিনি ইতিমধ্যে অন্যভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন - মাঠে সবুজ ঘাস খেয়ে বেড়ায় এরূপ গরুর দুধে শরীরের বৃদ্ধি উৎপাদক এক প্রকার উপাদান রয়েছে, কিন্তু যে সকল গরু খড় বা বিচুলি খেয়ে রয়েছে, তাদের দুধে সেরূপ কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই। নিশ্চয় সবুজ ঘাসের রস থেকে এই উপাদান দুধে সঞ্চিত হয়ে থাকে। পরীক্ষার ফলে এর সত্যতা সমর্থিত হল। কচি বা বাড়ন্ত ঘাসের রস শীতকালের দুধে মিশিয়ে ইঁদুরগুলিকে খাইয়ে দেখা গেল যে সেগুলি গ্রীষ্মকালের মতই দ্রুতগতিতে বর্ধিত হচ্ছে এবং গ্রীষ্মকালের অন্যান্য লক্ষণও পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। তখন ঘাসের রসের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকল না। রাসায়নিক পরীক্ষায় স্ক্যাবেলের আবিষ্কৃত তথ্য নির্ভুল প্রমাণিত হবার পর তিনি দেখতে পেলেন, কিছু কাল রেখে দিলেই শুষ্ক ঘাসের ভিটামিন ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে, কাজেই ঘাসের মধ্যে ভিটামিনকে স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে না পারলে বিশেষ কিছুই সুবিধা হবে না। এই জন্য অপেক্ষাকৃত উন্নততর প্রণালীতে ঘাস শুষ্ক করবার বিষয় চিন্তা করতে লাগলেন। ডেয়ারী সম্পর্কিত কোন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে শুষ্ক করবার একটি বিরাট যন্ত্র অনেক দিন থেকেই অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে ছিল। খবর পেয়ে তিনি যন্ত্রটি ধার করবার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

প্রেসিডেণ্ট, স্ক্যাবেলের নিকট ঘাসের অদ্ভুত প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবগত হয়ে এ সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, এবং তাঁর পরিকল্পনাকে কার্যকরী করবার নিমিত্ত একযোগে পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হলেন। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল ঘাসের চূর্ণগুলিকে দুধের সঙ্গে মিশ্রিত করবার পর যদি কাইয়ের মত ঘন করে নেওয়া যায় তবে ঘাসের ভিটামিন অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণভাবে থাকতে পারে। কারণ 'ভিটামিন-এ'কে কার্যকরী করবার নিমিত্ত ক্যারোটিন নামক অগ্রবর্তী পদার্থ (precursoı) রৌদ্র অথবা বাতাসে থাকলে শীঘ্রই অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু চর্বিজাতীয় কোন পদার্থের স্বাদ মিশ্রিত থাকলে তা অক্ষুণ্ণভাবেই থাকে। তাঁরা ঘাসের ভিটামিন অক্ষুণ্ণ ভাবে রাখবার ব্যবস্থা করে তার সাহায্যে হাঁস, মুর্গী প্রভৃতির উপর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। ফলে শীঘ্রই সেরোফিলের নূতন ব্যবসায় গড়ে উঠে। সেরোফিলের মধ্যে যে কেবল 'ভিটামিন-এ'ই রয়েছে তা নয়— এতে ভিটামিন-বি, সি, জি এবং শরীরপোষণোযোগী অন্যান্য অনেক পদার্থের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)

মশক দমনে জলজ-উদ্ভিদের অপূর্ব প্রভাব

****
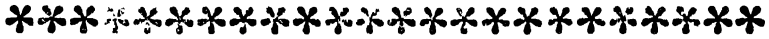
বছর কয়েক পূর্বে মশকভুক মাছ নিয়া পরীক্ষা করেছিলাম। খল্‌সে, পুঁটি, তেচোখা, চাঁদা, তেকাঁটা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ এবং শাল, শোল বোয়াল প্রভৃতি মাছের ছোট ছোট বাচ্চাগুলি সকলেই কম-বেশী মশার বাচ্চা উদরস্থ করে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখেছিলাম, আমাদের দেশীয় পাতি-চাঁদা এবং কোলা-ব্যাঙের ব্যাঙাচিগুলিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক মশক-শিশু উদরস্থ করে থাকে। অবশ্য এই মশক-ধ্বংসের পরিমাণ অনেকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। মশক-দমনে সাধারণতঃ তেচোখা মাছের কৃতিত্বের বিষয়ই বিশেষভাবে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু তেচোখা মাছগুলি সর্বদাই জলের উপরিভাগে ভেসে থাকে বলে মশক-শিশুর প্রাচুর্য থাকলেও অনেকেই তারা মাছের নজর এড়িয়ে আত্মরক্ষা করে থাকে। বাতাস গ্রহণ করবার জন্য মশার বাচ্চাগুলি জলের উপরিভাগে উঠে আসবার সময় দৈবাৎ নজরে পড়ে গেলেই কেবল তারা তেচোখা মাছের দ্বারা আক্রান্ত হয়। বাচ্চাগুলি জলের উপরে উঠেই নীচু দিকে মুখ করে নির্জীব খড়কুটার মত ঝুলে থাকে; কাজেই অনায়াসেই মাছের নজর এড়িয়ে যায়। কিন্তু চাঁদা, খল্‌সে প্রভৃতি মাছেরা জলের মধ্যে বিচরণ করে। কিলবিল করে উপরে ওঠবার সময় বেশ দূর থেকেও মশার বাচ্চাগুলি তাদের নজরে পড়ে এবং তৎক্ষণাৎ ছুটে এসে তাদিগকে উদরসাৎ করে ফেলে। বিভিন্ন জাতীয় মাছের মশার বাচ্চা উদরস্থ করবার উদ্দেশ্যে পরীক্ষাগারে ছোট বড় অনেকগুলি কাচের জলাধারে মাছ ও মশার বাচ্চা রেখে পর্যবেক্ষণ করছিলাম। দেখলাম—প্রায় আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই একটা জলাধারের পাঁচটা চাঁদা মাছ ছিয়াশীটি মশক-শিশু উদরস্থ করে ফেলল কিন্তু অপর একটি জলাধারে সমানসংখ্যক তেচোখা-মাছেরা ঐ সময়ের মধ্যে বার-তেরটির বেশী মশার উদরস্থ করতে পারে নাই। মাছ ও মশার বাচ্চাগুলি স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবে বলে কতকগুলি জলাধারে জলঝাঁঝি, পাটা শ্যাওলা এবং অন্যান্য কয়েক প্রকার জলজ উদ্ভিদ রেখেছিলাম কিন্তু ঘোলা জল এবং লতাপাতার প্রতিবন্ধকতার জন্যই খুব সম্ভব ঐ সকল ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফল আশানুরূপ সন্তোষজনক হয় নাই। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার জন্য অনেকগুলি জলাধার রাখা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে ছয়টি ছিল—জলজ উদ্ভিদপরিপূর্ণ; কিন্তু বাকী সবগুলিতেই পরিষ্কার জলে মশার বাচ্চা কিলবিল করছিল। পরীক্ষার জন্য একবার সময়মত মৎস্য সংগ্রহ করতে না পারায় জলজ-উদ্ভিদপূর্ণ জলাধার থেকে মাছগুলি তুলে এনে পরিষ্কার জলাধারে ছেড়ে দিয়া-

ছিলাম। লতাপাতাপূর্ণ জলাধারগুলিতে যে-সকল মশার বাচ্চা ছেড়েছিলাম সেগুলি তেমনই রয়ে গেল। তিন-চার দিন পর নজর পড়তেই দেখলাম—জলজ উদ্ভিদ-পূর্ণ জলাধারগুলিতে মশার বাচ্চার সংখ্যা যেন কম বোধ হচ্ছে। আরও কয়েক দিন পরে ঐ সকল জলাধারে ক্বচিৎ দুটি-একটি ছাড়া মশার বাচ্চা দেখতেই পেলাম না। এতগুলি মশার বাচ্চা কিরূপে অদৃশ্য হল বুঝতেই পারলাম না ; কারণ এর কোনটিতেই একটিও মাছ ছিল না। এতগুলি বাচ্চা যে মশার রূপ ধারণ করে উড়ে পলায়ন করে নি তা সুনিশ্চিত। কারণ—ট্যাঙ্কগুলির মুখ পাত্‌লা জালে আচ্ছাদিত ছিল। তার পর আরও কয়েকবার এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছি। অনাবৃত জলাধারগুলি পাশাপাশি সজ্জিত রয়েছে। পরিষ্কার জলে মশার বাচ্চা কিল্‌বিল করছে অথচ জলজ-উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারে মশার বাচ্চা নজরে পড়ে না। তবে কি জলজ উদ্ভিদপরিপূর্ণ জলাধারে মশকেরা ডিম পাড়ে না ? ব্যাপারটায় যথেষ্ট কৌতূহলের সঞ্চার হলেও মশকভুক মাছ সম্বন্ধে পরীক্ষায় ব্যাপৃত থাকায় এ বিষয়ে তেমন কিছু মনোযোগ দিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে কোলা-ব্যাঙের ব্যাঙাচির মশক-শিশু ভক্ষণের ব্যাপার অকস্মাৎ নজরে পড়ে। এই ব্যাঙাচির জীবনযাত্রা-প্রণালীর বিষয় সম্যক্ অবগত হবার জন্য বহু স্থানে নালা, ডোবা ও অন্যান্য স্থায়ী এবং অস্থায়ী জলাভূমিসমূহ বিশেষ ভাবে অনুসন্ধান করতে হয়েছিল। এই সময়ে মশার বাচ্চার উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে অনেকগুলি অদ্ভুত বিষয় নজরে পড়ে। পূর্বোক্ত পরীক্ষার সময় জলজ-উদ্ভিদপূর্ণ জলাধারে যে ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম, স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও সেরূপ অনেকগুলি ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। সাধারণতঃ জলজ-উদ্ভিদ-বিবর্জিত পচা জল পরিপূর্ণ অস্থায়ী জলাশয়েই মশক-শিশুর প্রাবল্য দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু পাটা-শ্যাওলা, জল-ঝাঁঝি ও অন্যান্য বহুবিধ জলজ-উদ্ভিদপরিপূর্ণ অথবা সম্পূর্ণরূপে পানায় আবৃত অধিকাংশ জলাশয়ে মশার বাচ্চা এক প্রকার নাই বললেই চলে।

বিশেষ পরীক্ষাকার্যের প্রয়োজনে কিছুকাল পূর্বে পরীক্ষাগারে এক-কোষিক আণবিক উদ্ভিদ ও সূত্রবৎ শৈবাল জাতীয় জলজ উদ্ভিদ জন্মাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। বড় বড় গামলা জলপূর্ণ করে তাতে নাইটেলা, কারা, হাইড্রিলা, ভেলেস্‌নেরিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ প্রতিপালিত হচ্ছিল। কিছু কাল পরে দেখা গেল—কতকগুলি গামলায় উদ্ভিদগুলি স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেলেও কয়েকটি গামলার উদ্ভিদ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-সকল গামলায় উদ্ভিদগুলি প্রচুর পরিমাণে জন্মেছে তাতে একটিও মশার বাচ্চা নাই। কিন্তু যেখানে গাছগুলি মোটেই জন্মে নাই এবং যেখানে সেগুলি মরে পচে উঠেছিল তথায় প্রচুর পরিমাণ মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে। এই ঘটনা লক্ষ্য করবার পর এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলাম। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে—দিনের বেলায় এই সকল জল-নিমজ্জিত উদ্ভিদ থেকে অনবরত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য বুদ্‌বুদ্ সূক্ষ্ম

সূত্রাকারে উপরে উঠে আসছে। এগুলি অক্সিজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদ্‌। আলোর প্রভাবে উদ্ভিদ-দেহে সংগঠন-উপযোগী খাদ্যবস্তু প্রস্তুতের সময় এই গ্যাস নির্গত হয়। অনেকবারই মনে হয়েছিল—এই অক্সিজেন কি মশার বাচ্চা নিয়ন্ত্রণে কোন প্রভাব বিস্তার করে থাকে? কিন্তু এরূপও ত হতে পারে যে ঐ সকল উদ্ভিদ থেকে কোন পদার্থ নির্গত হয়ে জলের সঙ্গে মিশ্রিত হবার ফলেই মশার বাচ্চাগুলি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে জলজ-উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ কয়েকটি বদ্ধ জলাশয়ে একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম। সেখানে মশার বাচ্চার সন্ধান না মিললেও অন্যান্য জলজ কৃমি, কীটের অভাব ছিল না। কাজেই সন্দেহ করবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ ছিল যে, উদ্ভিদ থেকে কোন বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হলে সকল প্রকার কৃমি, কীটই বিনষ্ট হত। যাহোক, মশক নিয়ন্ত্রণে জলজ-উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা কে কি গবেষণা করেছেন সে সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে দেখতে পেলাম, মশক বিনাশের উপায় নিবারণকল্পে বিভিন্ন দেশের যে সকল বৈজ্ঞানিক, গবেষণা এবং অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়েছেন তাঁদের অনেকেই বিশেষ কয়েক প্রকার জলজ-উদ্ভিদের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের পর্যায় অতিক্রম করে প্রকৃত গবেষণার ক্ষেত্রে অধিক দূর অগ্রসর হয়। অনেকেই জলজ-উদ্ভিদ সমন্বিত জলাশয়ে মশার বাচ্চার অভাব লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু এর বিপরীত ঘটনাও যে লক্ষিত হয় নাই —এমন নয়। তবে এ কথা ঠিক যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে - বিশেষ বিশেষ জলজ-উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ জলাশয়ে সাধারণত মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে না অথবা জন্মগ্রহণ করলেও কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের অধিকাংশই বিনষ্ট হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণ এবং গবেষণার ফলে মশক-দমনে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে যতদূর জানতে পারা গেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার পূর্বে মশকের বিষয় কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্রকায় পতঙ্গ হলেও মশকেরা আমাদের সঙ্গে যেরূপ ভয়াবহ শত্রুতা সাধন করে থাকে তা কারও অবিদিত নয়। কেবল মানুষই নয়, জন্তু-জানোয়ারেরাও এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায় না। ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু প্রভৃতি রোগের বীজাণুসমূহ বিভিন্ন জাতীয় মশক কর্তৃকই মনুষ্যশরীরে সংক্রামিত হয়ে থাকে। জীবজন্তুর কয়েকটি বিশেষ রোগও মশক কর্তৃক দেহান্তরে পরিচালিত হয়। কেবল রোগবীজাণু সংক্রমণের ব্যাপারেই নয়, মশকের অভাবনীয় আধিক্যহেতু এদের দলবদ্ধ দংশন যন্ত্রণার ভয়ে বাসোপযোগী অনেক স্থান সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে। অনুসন্ধানকারী এবং ভ্রমণকারীদের অনেকেই দলবদ্ধ মশকের ভীষণ আক্রমণের কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এক সময়ে আমাদের দেশেও যে কোন কোন অঞ্চলে দলবদ্ধ মশক আক্রমণে লোকের জীবন বিপন্ন হত; এরূপ ঘটনার কথা বিরল নয়। মশকের যে ম্যালেরিয়া রোগবীজাণু বহন করে একথা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত মানুষের অজ্ঞাত ছিল। ১৮৯৮

খ্রীঃ অব্দে সার রোনাল্ড রস্ তাঁর এই অদ্ভুত আবিষ্কারের কথা প্রচার করেন যে, ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী জীবাণুগুলি তাদের জীবনের মধ্যমাংশে মশকের দেহাভ্যন্তরে পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। এই সময়ে মশক কর্তৃক দংশিত হলে রোগবীজাণু মনুষ্য দেহে সংক্রামিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে Culex pipiens নামক সাধারণত পরিচিত কেবলমাত্র এক জাতীয় মশার মোটামুটি জীবনবৃত্তান্ত জানা ছিল। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ডঃ হাওয়ার্ড এক জাতীয় অ্যানোফেলিস মশার জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। অ্যানোফেলিস মশকেরাই ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে বলে বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে এদের সম্বন্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলতে থাকে। ম্যালেরিয়ার মত ব্যাপক এবং মারাত্মক ব্যাধি বোধ হয় কমই আছে। যদিও কুইনিন এবং তার অন্যান্য যৌগিক পদার্থসমূহ ম্যালেরিয়ার প্রতীকারার্থ ব্যবহৃত হয়ে থাকে তথাপি এটি সম্পূর্ণ অব্যর্থ নিরোধক নয়। রোগবীজাণুবাহক অ্যানোফিলিস মশকের উৎপত্তি নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে ম্যালেরিয়া দমনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

কেবল ম্যালেরিয়াই নয়—ক্রমশ দেখা গেল, অন্যান্য রোগও মশক কর্তৃক মনুষ্যদেহে পরিচালিত হয়ে থাকে। ১৯০০ খ্রীঃ অব্দে ডঃ রিড্ মশক সম্বন্ধে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয় প্রকাশ করেন। তাতে দেখা যায় যে, Aedes aegypti অথবা Aedes argeneus নামক একজাতীয় মশকের দংশনের ফলেই পীতজ্বর মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়। পীতজ্বরের উৎপত্তি পশ্চিম-আফ্রিকায়; কিন্তু পণ্যবাহী জাহাজাদির আশ্রয়ে রোগবীজাণু বাহক মশকেরা আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে পরে জানা গেছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পীতজ্বরের বীজাণু বহনকারী প্রায় ১৩।১৪ রকমের মশকের অস্তিত্ব রয়েছে। এস্থলে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রোনাল্ড রসের আবিষ্কারের প্রায় ১৯ বছর পূর্বে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে সার প্যাট্রিক ম্যান্সন দেখতে পেয়েছিলেন যে, Filaria bancrofti নামক কৃমিবৎ একপ্রকার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রোগবীজাণু জীবনের একাংশ মশকের উদরে অতিবাহিত করে থাকে। কিন্তু কি ভাবে এরা মশকের উদরে আশ্রয় গ্রহণ করে, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তা জানতে পারা যায় না। ১৯০৩-৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জানতে পারা যায় যে, ব্যাপকভাবে সংক্রমণশীল ডেঙ্গু-জ্বরও Culex fatigins নামক মশকের সাহায্যে মনুষ্যদেহে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিস্তৃত গবেষণার ফলে পরে দেখা যায় যে, Aedes albopicus এবং Ades argenteus নামক মশকেরাই এই রোগের প্রকৃত বাহক।

মশক কর্তৃক এরূপ কয়েকটি সাংঘাতিক রোগ মনুষ্যদেহে সংক্রামিত হয়, একথা প্রমাণিত হবার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মশকের জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রবল উদ্যমে অনুসন্ধান ও গবেষণা চলতে থাকে। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২৪২টি বিভিন্ন জাতীয় মশকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে তিন হাজারের বেশী বিভিন্ন

জাতীয় মশকের অস্তিত্বের খবর জানা গেছে। সকল জাতীয় মশকের বাচ্চাই জলে অবস্থান করে। তবে কোন কোন মশকের ডিম ফুটতে পাঁচ-সাত দিন মাত্র সময় লাগে আবার কারও কারও ডিম ফুটতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়ে যায়। প্রবল স্রোত ব্যতীত পরিষ্কৃত, অপরিষ্কৃত, বদ্ধ বা মুক্ত, ছোট বড় যে-কোন জলাশয় বা জলাধারে মশকেরা তাদের ডিম পেড়ে রাখে। মশক বংশবিস্তারের অনুকূল অথবা প্রতিকূল স্থান, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রায়াজনীয় তথ্যাদি অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকেরা নানাপ্রকার পরীক্ষা করতে থাকেন। এর ফলে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রথমে যাঁরা অনুসন্ধান আরম্ভ করেছিলেন তাঁরা দেখলেন—কতকগুলি জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে অথচ তদনুরূপ অন্যান্য কতকগুলি জলাশয়ে একটিও মশক-শিশুর অস্তিত্ব নেই। তখন তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, খাদ্যের প্রাচুর্য বা অভাববশতই এরূপ ঘটে থাকে। কেউ কেউ বললেন—ঘনসন্নিবিষ্ট উদ্ভিদ-পত্রাদি জলের উপরিভাগ আবৃত করে রাখলে সেখানে মশক-শিশুরা বাইরের বাতাস সংগ্রহ করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেকে আবার এই অভিমত প্রকাশ করলেন যে, জলের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ শেওলা জাতীয় উদ্ভিদের আধিক্য হলে বাচ্চাগুলি তাতে জড়িয়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়। অবশ্য বিভিন্ন জাতীয় মাছ ও অন্যান্য জলজ পোকামাকড়েরা যে মশার বাচ্চা ধ্বংস করে থাকে এটাও অনেকে লক্ষ্য করেছিলেন।

যাই হোক, বিভিন্ন জাতীয় জলজ উদ্ভিদেরা যে মশার বাচ্চা ধ্বংসের কারণ হতে পারে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অতি অল্পদিন পূর্বে। কতকগুলি উদ্ভিদ যে মশা-মাছি উদরস্থ করে থাকে এ ঘটনা অবশ্য অনেক পূর্বেই জানা গিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে ডারুইন কীটপতঙ্গভুক উদ্ভিদের বিষয় বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এদের শিকার ধরবার কৌশল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু অবগত হতে পারেন নাই। ঐ সময়েই মিসেস্ ট্রীট কৃমি-কীটভোজী ইউট্রিকুলেরিয়া নামক জলজ উদ্ভিদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য মৃত কীট দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু এর প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেন নাই। ১৯১১-২৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্রোচার, হেগ্‌নার প্রমুখ গবেষণাকারীদের বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে একথা সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয় জলজ-উদ্ভিদেরা কীট-পতঙ্গের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ-কীড়া উদরস্থ করে দেহ পুষ্ট করে থাকে। ৭ ফুট লম্বা একটা ইউট্রিকুলেরিয়ার থলিগুলির মধ্যে হেগ্‌নার ১৫০,০০০-এর অধিক সংখ্যক কীড়া দেখতে পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে অসংখ্য মশার বাচ্চাও ছিল। এই হিসাবে মশক-নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বিবেচনা করলে এই উদ্ভিদের কার্যকারিতার বিষয় সহজেই উপলব্ধি হবে। এতদ্ব্যতীত পানা-জাতীয় বিভিন্ন রকমের ভাসমান উদ্ভিদের সংখ্যাধিক্যের ফলে যে অনেক ক্ষেত্রে মশকের জন্ম নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এটি অনেকে লক্ষ্য করেছে। অবশ্য কেউ কেউ এর বিপরীত দৃষ্টান্তের কথাও উল্লেখ করেছে।

জলের উপরে ভাসমান পানাজাতীয় উদ্ভিদ ছাড়াও সাধারণ লতাগুল্মের মত অসংখ্য রকমের জলনিমজ্জিত উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এরা জলের নীচে কর্দমাক্ত মাটিতে শিকড় চালিয়ে জলের প্রায় উপরিভাগ পর্যন্ত বেড়ে থাকে। এদের মধ্যে 'কারাসি' গণভুক্ত বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ নিয়ে অনেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মশক দমনে তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে। কেউ কেউ আবার লক্ষ্য করেছেন যে, 'কারা' জাতীয় উদ্ভিদে আচ্ছন্ন এক জলাশয়ে মশার বাচ্চার চিহ্ন-মাত্র দেখা যায় না ; অথচ অনুরূপ আর এক জলাশয়ে অসংখ্য বাচ্চা কিলবিল করছে। এইরূপ পরস্পরবিরোধী ফলাফল দেখে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে প্রোঃ ম্যাথেসন্ Chara vulgaris নামক জলজ-উদ্ভিদ নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। প্রকৃত কারণ কি—তা নির্ধারিত না হলেও তাঁর পরীক্ষার ফলে এটাই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারা যায় যে, এই জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ অধ্যুষিত জলাশয়ে মশক-শিশুরা মোটেই বৃদ্ধি পেতে পারে না।

মশক দমনে জলজ উদ্ভিদের প্রভাব সম্বন্ধে উপরিউক্ত বিষয়সমূহ অবগত হবার পর কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশীয় অ্যানোফিলিস, কিউলেক্স এবং অন্যান্য দুই-এক জাতীয় মশকের কীড়া এবং নাইটেলা, হাইড্রিলা, কারা, ভ্যালিস্‌নেরিয়া প্রভৃতি এদেশীয় জলজ-উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেছি। পরীক্ষার ফলে এ পর্যন্ত যা জানা গিয়েছে এস্থলে তার মোটামুটি বিবরণ দিচ্ছি। প্রথমত উপরিউক্ত জলজ-উদ্ভিদগুলি কাচের জলাধারে উন্মুক্ত অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে রাখা হয়েছিল। পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার জলপূর্ণ আরও কতকগুলি উন্মুক্ত কাচের জলাধার পাশাপাশিই সজ্জিত ছিল। এদের একটিতেও জলজ-উদ্ভিদ রাখা হয় নাই। কয়েক দিন পরেই দেখা গেল জলজ-উদ্ভিদ-বিবর্জিত জলাধারগুলিতে কম-বেশী যথেষ্ট মশক-শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ একটি জলাধারেও মশক-শিশু দেখা যাচ্ছে না। দিন দুই পরে ভ্যালিস্‌নেরিয়ার জলাধারে গুটি তিনেক ক্ষুদ্রকায় মশার বাচ্চা দেখতে পেয়েছিলাম ; কিন্তু তাও আবার দুই দিন পরে অদৃশ্য হয়ে গেল। পরীক্ষার ফলে দেখলাম—শেওলা অধ্যুষিত জল কিঞ্চিৎ ক্ষারধর্মী হয়েছে। তবে কি ক্ষারধর্মী জলে বাচ্চাগুলি বাঁচতে পারে না? ঐ জল অন্য পাত্রে ঢেলে রেখে দিলাম। পাঁচ-সাত দিন পরে দেখি তাতে কিছু কিছু মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে। উদ্ভিদ-বিবর্জিত এবং উদ্ভিদসমন্বিত উভয় প্রকার জলেই দু-চারটি করে ক্ষুদ্রকায় জল-পোকা ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা যেমন ছিল তেমনই আছে। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জাতীয় জলজ-উদ্ভিদ থেকে কম-বেশী অক্সিজেন-বুদ্বুদ নির্গত হত। হিঞ্চে, কল্‌মি, জল-ঘাস প্রভৃতি অর্ধ নিমজ্জিত উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষার ফলে দেখলাম সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই মশার বাচ্চা জন্মগ্রহণ করছে। কাজেই উদ্ভিদ-দেহ নির্গত অক্সিজেনই মশক-ধ্বংসের প্রকৃত কারণ বলে মনে হল। যাই হোক, ফলাফল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য জলজ-উদ্ভিদ পরিপূর্ণ জলাধারে

অন্য স্থানে থেকে মশক-শিশু এনে ছেড়ে দিলাম। দু-তিন দিনের মধ্যেই তারা প্রায় সকলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে একই রকম ফল দেখতে পেয়ে এবার সোজাসুজি অক্সিজেন প্রয়োগের ব্যবস্থা করলাম। অক্সিজেন সিলিণ্ডার থেকে সূক্ষ্ম টিউব সহযোগে পোর্সেলিন ফিল্টারে মধ্য দিয়ে মশার বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারের তলার দিক থেকে গ্যাস প্রয়োগ করতে লাগলাম। জলজ-উদ্ভিদ থেকে যেভাবে সূত্রাকারে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বুদ্বুদ উত্থিত হয় এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ভাবেই অসংখ্য বুদ্বুদ উঠছিল। ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা গ্যাস প্রয়োগের সময় বাচ্চাগুলি যেন অস্বস্তিকর অবস্থায় কিলবিল করছিল। দু-তিন ঘণ্টা পর তাদিগকে আর বড় একটা উপরের দিকে উঠতে দেখা গেল না। সকলেই তখন জলের তলায় আশ্রয় নিয়েছে। দুদিন পর দেখলাম জলাধারে একটিও মশার বাচ্চার অস্তিত্ব নাই। গ্যাসের চাপ হ্রাস করে বুদ্বুদের সংখ্যা কমিয়ে দিলাম। তার ফলে দুদিন পরে দেখলাম, বাচ্চাগুলির সংখ্যা হ্রাস পেলেও সবগুলিই বিনষ্ট হয় নাই। বুদ্বুদের সংখ্যা কম রেখে গ্যাস প্রয়োগের সময় বাড়িয়ে দিলাম। দ্বিতীয় দিনে দেখা গেল সমস্ত বাচ্চাই অদৃশ্য হয়েছে। অথচ যে-সকল জলাধারে গ্যাস প্রয়োগ করা হয় নাই তাদের বাচ্চাগুলি ক্রমে ক্রমে মশকে রূপান্তরিত হচ্ছিল। এই সকল ঘটনা থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, খুব সম্ভব জলজ-উদ্ভিদ থেকে নির্গত অক্সি-জেনই মশক শিশু বিনাশের কারণ ঘটিয়ে থাকে; কিন্তু কি ভাবে এটি কার্যকরী হয় তা বলা অধিকতর পরীক্ষাসাপেক্ষ।

আমাদের দেশে খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়ে ইউট্রিকুলেরিয়া জাতীয় কীট-ভোজী জলজ-উদ্ভিদের অভাব নাই। মশার বাচ্চা পরিপূর্ণ জলাধারে এই গাছ-গুলিকে রেখে দেখেছি তারা অল্পদিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলিকে উদরস্থ করে ফেলে। অবশ্য ক্ষুদ্রকায় বাচ্চাগুলিই বেশীরভাগ এদের ফাঁদে পতিত হয়ে থাকে। তাছাড়া আমাদের দেশীয় গুঁড়ি-পানা, ইঁদুরকানী পানা প্রভৃতি যেসকল জলাশয়কে ঘন-সন্নিবিষ্টভাবে আবৃত করে রাখে তথায় মশার-বাচ্চা কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হবে। পানার আবরণ ভেদ করে মশকেরা সাধারণত ডিম পাড়তে পারে না; আর ডিম পাড়লেও বাচ্চা বের হবার পর তারা জলের উপর থেকে বাতাস সংগ্রহ করতে না পেরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে সকল জলাশয়ে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি রং-বেরঙের আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদের আধিক্যবশত পুরু সরের মত আস্তরণ পড়ে সে-সকল জলাশয়েও বোধহয় পূর্বোক্ত কারণেই মশক-শিশুর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায় না। পানা অথবা আণুবীক্ষণিক 'য়্যালগি' জাতীয় উদ্ভিদের দ্বারা অংশবিশেষ আবৃত জলাশয়ের পক্ষে অবশ্য এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা চলে না। মোটের উপর দেখা যায়, মশকেরা যেখানে সেখানে অনায়াসে জন্মগ্রহণ করতে পারলেও কেবলমাত্র মৎস্যাদি প্রাণীই নয়, বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদেরাও অহরহ প্রভূত পরিমাণে তাদের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রকৃতির রাজ্যে এইভাবেই সাম্য রক্ষিত হয়ে থাকে।

(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৫০)

এক-বীজপত্রী কয়েকটি উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গমের কৌশল

****
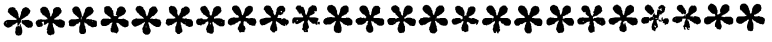
নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে কদাচিৎ উচ্চতর প্রাণীদের মত সন্তান-বাৎসল্য পরিলক্ষিত হয়। নিম্ন শ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে কেউ কেউ সন্তান জন্মের পরেও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিম পেড়েই তাদের সন্তানপালনের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করে থাকে। মাছ, কচ্ছপ, ব্যাং, শামুক, প্রজাপতি, ফড়িং প্রভৃতি প্রাণীদের ডিমের প্রতি যথেষ্ট বাৎসল্যের পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু ডিম পাড়বার পর তাদের সঙ্গে আর কোনই সম্বন্ধ রাখে না, অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মেই ডিমের মধ্যে ভ্রূণের পরিপুষ্টি লাভ করবার জন্য যথেষ্ট উপকরণ সঞ্চিত থাকে এবং তা থেকেই পুষ্ট হয়ে ডিম থেকে যথাসময়ে সন্তান জন্মগ্রহণ করে থাকে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ না করলেও তারা এই দুর্বল শিশুদের রক্ষার নিমিত্ত পূর্বাহ্নেই এমন স্থান নির্বাচন করে ডিম পাড়ে, যাতে তারা ডিম থেকে বহির্গত হয়ে শরীর পুষ্টিকারক অজস্র খাদ্যসামগ্রী তাদের মুখের সামনেই সজ্জিত দেখতে পায়। এটাই যা কিছু তাদের সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয়।

প্রাণী-জগতের অনুরূপ এইরূপ সন্তান-বাৎসল্যের পরিচয় উদ্ভিদ্-জগতেও অহরহ পাওয়া যায়। উদ্ভিদের বীজ প্রাণীদের ডিমেরই অনুরূপ, উদ্ভিদ-শিশু ভ্রূণরূপে বীজের মধ্যেই লুক্কায়িত থাকে এবং অঙ্কুরিত হবার পর যথেচ্ছ বর্ধিত হবার নিমিত্ত পূর্ব থেকেই যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য বীজে সঞ্চিত থাকে। উপযুক্ত স্থানে ঐ বীজ পতিত হয়ে উদ্ভিদ্ বংশ বিস্তার করে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার নিষ্পেষণে অনেকেই জীবন সংগ্রামে পরাভূত হতে বাধ্য হয়। এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্ধার এবং অপমৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ-বীজ বিভিন্ন প্রকারের কৌশল আয়ত্ত করেছে। এই বিষয়ে জীব ও উদ্ভিদে অতি সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আবার জীব-জগতে যেমন দেখা যায় ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলেও যত দিন পর্যন্ত তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারে, তত দিন পর্যন্ত মা তার সন্তানগুলিকে কোলে পিঠে করে বহন করে বেড়ায়—উদ্ভিদ-জগতেও সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কোন কোন মনসা গাছ, অর্কিড ও আনারস গাছে এরূপ সন্তান-বাৎসল্য পরিলক্ষিত হয়। এদের শিশু-বৃক্ষগুলি কাণ্ডের অগ্রভাগে অথবা দোদুল্যমান প্রবাহণীতে আবদ্ধ হয়ে বাড়তে থাকে। যখন যথেষ্ট শিকড় গজিয়ে স্বতন্ত্রভাবে জীবন যাপন করবার উপযুক্ত হয়, তখন খসে মাটিতে পড়ে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর

প্রাণীদের মধ্যে যেমন দেখা যায় যে, ডিম ফুটে বাচ্চা বের হলেই তাদিগকে নিজের উপর নির্ভর করতে হয় এবং তার ফলে অনেকেই জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে না, উদ্ভিদ্-জীবনেও সাধারণত এরূপ ঘটনাই সচরাচর নজরে পড়ে। লাউ, কুমড়া, ধান, যব প্রভৃতি শস্যের বীজ উপযুক্ত স্থানেই অঙ্কুরিত হয় এবং শৈশবাবস্থায় বাঁচবার জন্য এদের বীজপত্রে যথেষ্ট খাদ্যও সঞ্চিত থাকে সত্য, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকবার মত যথেষ্ট সাহায্যের অভাবে অনেককেই অকালে উদ্ভিদলীলা সংবরণ করতে হয়। উদ্ভিদের অঙ্কুর বের হবার পূর্বেই শিকড় বের হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে, তারপর অঙ্কুর আত্মপ্রকাশ করে। বৃক্ষ-শিশু নিজের ক্ষমতায় খাদ্য আহরণ করতে না পারা পর্যন্ত বীজপত্রে সঞ্চিত খাদ্য থেকে তার দেহপুষ্টি হতে থাকে। লাউ, কুমড়া, শশা, ধান, যব প্রভৃতি স্বল্পকালস্থায়ী উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগমের সময় শিকড় গজিয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকবার ব্যবস্থা করে নেয়, কিন্তু তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি এক-বীজপত্রী বড় বড় উদ্ভিদ্‌কে অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করে করে বহু বছর বেঁচে থাকতে হয়। এদের কাণ্ডও হয় বিরাট আয়তনের। অথচ সেই তুলনায় তাদের বীজাভ্যন্তরস্থ ভ্রূণ, লাউ, কুমড়া ধান, যব প্রভৃতি ভ্রূণের মতই দুর্বল ও অসহায়। লাউ, কুমড়া, ধান, যব প্রভৃতি উদ্ভিদ-কাণ্ডের হয়ত দুই-এক ফুট বা সামান্য কিছু বেশী উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় —অন্যথায় ভূমিতে নুয়ে পড়লেও ক্ষতি নাই; কিন্তু তাল, নারিকেল প্রভৃতি উদ্ভিদের স্থূলকায় কাণ্ডগুলিকে যেখানে ৩০।৪০ হাত উঁচু হয়ে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতে হয়, সেখানে তাদের শিথিল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা চলে না; মূলদেশ গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন, তা না হলে সামান্য দুর্বিপাকেই তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই সব বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাবার নিমিত্তই যেন তারা তাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অন্যান্য সাধারণ বীজ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় অঙ্কুরোদগমের অভিনব পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

তালের বীজ বা আঁঠিগুলি কতকটা গোলাকার, কিন্তু চেপ্টা। দেখতে কতকটা পাথরের নুড়ির মত, সুদৃঢ় খোলায় আবৃত। আঁঠিগুলি সচরাচর মাটির উপরেই পড়ে থাকে। মাটির উপরেই থাক বা পাথরের উপরই থাক, কিছুদিন বৃষ্টি পেলে বা স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া থাকলেই ঊর্ধ্বদিকের প্রান্তভাগের মধ্য থেকে সূচালো ডগাবিশিষ্ট শিকড়ের মত একটা লম্বা নল বের করে দেয়। সাধারণত বীজের অঙ্কুর বের হবার পূর্বেই শিকড় বের হয়ে থাকে। তালের বীজ থেকে অঙ্কুর বের হবার পূর্বে শিকড়ের মত এই পদার্থটি দেখে শিকড় বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়; প্রকৃত প্রস্তাবে এটি কিন্তু শিকড় নয়। একে তাল-শিশুর নাভি-রজ্জু বলা যেতে পারে। উচ্চতর প্রাণীদের ভ্রূণ যেরূপ মাতৃগর্ভে নাভি-রজ্জুর সাহায্যে পরিপুষ্ট হয়ে থাকে, তাল-শিশুও এই অদ্ভুত যন্ত্রটির সাহায্যে বীজ থেকে বহু দূরে অবস্থান করেও বীজাভ্যন্তরস্থ খাদ্যে পরিপুষ্ট হয়। এই রজ্জুটি বীজের অভ্যন্তরে

অবস্থিত ক্রমবর্ধমান স্পঞ্জের মত একটি ফোঁপল থেকে বের হয়ে আসে। এটি নলের মত, ভিতরে ফাঁপা ; কিন্তু সূচালো প্রান্তভাগ সম্পূর্ণ নিরেট। এই সূচালো প্রান্তের অভ্যন্তরে বীজাঙ্কুর অবস্থান করে। অঙ্কুরটি উল্টোমুখে নলের মধ্যে থেকে লম্বালম্বিভাবে বাড়তে থাকে। নলের সূচালো মুখের ডগার সঙ্গে থাকে এর গোড়ার দিক। নলটা চিরে ফেললে এ সবই প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু বাইরে থেকে এটিকে একটা সাধারণ শিকড় ছাড়া আর কিছুই মনে করা হয় না। এই নলটির প্রধান কাজই হচ্ছে বীজের ভিতর থেকে ভ্রূণটিকে অতি সন্তর্পণে এবং সঙ্গোপনে গভীর মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত করা এবং সেখানে যতদিন পর্যন্ত সে শিকড় গেড়ে বসতে না পারে ততদিন পর্যন্ত মাটির উপরিস্থিত বীজ থেকে খাদ্য এনে তার শরীরের পুষ্টি সাধন করা। অনেক ক্ষেত্রেই বীজ থেকে নলটি বের হয়ে ভিতরে প্রবেশ করবার মত নরম মাটির সন্ধান পায় না ; কাজেই কখনও কখনও তাকে অনেক দূর পর্যন্ত মাটির উপর দিয়েই অগ্রসর হতে হয়। অন্ধকার ছাড়া আলোতে এরা বাড়তে পারে না বলে সর্বদা জঞ্জাল, আবর্জনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়। পাথরের উপর বীজটি পড়ে থাকলে, নরম মাটির সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত পাথর অতিক্রম করে এঁকে-বেঁকে বা মোচড় খেয়ে চলতে থাকে। নরম মাটির সন্ধান পেলেই খাড়াভাবে মৃত্তিকাভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। যতই ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে মধ্যস্থিত ভ্রূণের বৃদ্ধিহেতু এটি ততই মোটা হয়ে যায়। বীজ থেকে বের হয়ে মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার পূর্ব পর্যন্ত এটি একটি সাধারণ কলমের মত মোটা থাকে, কিন্তু মাটির নীচে সম্পূর্ণরূপে প্রবেশ করবার পর দেড় ইঞ্চি থেকে দুই ইঞ্চি কি ততোধিক মোটা হয়ে যায়। এইরূপে নলটা প্রায় এক ফুট দেড় ফুট নীচে চলে গেলে তন্মধ্যস্থ বৃক্ষ-শিশুর উদগত হবার সময় এসে পড়ে। তখন সেই নলের সূচালো মুখটি ক্রমশঃ যেন উল্টোমুখে ভিতরের দিকে যেতে থাকে। অর্থাৎ সূচালো মুখটির বৃদ্ধি তখন শেষ হলেও পরিবেষ্টিত স্থানগুলি বাড়তে থাকে, ফলে দেখায় যেন সূচালো মুখটি ভিতরে ঢুকে পড়ছে। এই সময়ে সূচালো মুখের নিকট থেকে একটা মোটা মূল শিকড় উদগত হয়ে নীচের দিকে চলে যায় এবং আশেপাশেও শিকড় গজাতে থাকে। ইতিমধ্যে কিন্তু বৃক্ষ-শিশু নলের অভ্যন্তরে প্রায় ছয়-সাত ইঞ্চি লম্বা বাঘ-নখের মত একটা শক্ত আবরণ নিয়ে বেড়ে উঠেছে। শিকড় মাটিতে প্রবেশ করবার পর এই বাঘ-নখের মত বৃক্ষ-শিশুটি নলের বুক চিরে মৃত্তিকাভ্যন্তরেই বের হয়ে পড়ে। একেই প্রকৃতপ্রস্তাবে তালগাছের অঙ্কুর বলা যেতে পারে। তখন বাইরে থেকে বুঝবার জো নাই যে, ঠিক কোন্ স্থান থেকে তালের চারা মাটি ফুঁড়ে বের হবে। প্রায় তিন-চার মাস পরে হঠাৎ দেখা গেল—যেখানে আঁঠিটি পড়েছিল, সেখান থেকে প্রায় হাতখানেক ব্যবধানে পাখীর পালকের মত লম্বা একটি পাতা মাটি ভেদ করে উঠছে। তালের ভ্রূণটি বাঘ-নখের মত ঐরূপ একটি তীক্ষ্মাগ্র কঠিন আবরণে আবৃত না থাকলে তার পক্ষে এত মাটির নীচে থেকে

বের হয়ে আসা অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার হয়ে পড়ত। বাঘ-নখের মত বৃক্ষ-শিশুটি বাড়তে বাড়তে যখন উপরের মাটির কাছাকাছি আসে, তখন ভিতর থেকে একটি সরু মুখ লম্বা পাতা বের করে দেয়। প্রায় বছরখানেকের মধ্যেই ক্রমশঃ গোলাকার পাতা বের করে প্রকৃত তালগাছের আকৃতি ধারণ করে। শৈশবের প্রথমাবস্থায় তাল, খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষ-শিশুর পাতার আকার প্রায় একই রকম থাকে ; দেখে সহজে কোন পার্থক্য নজরে পড়ে না।

আঁঠির ভিতর থেকে বের হয়ে নলটা মতই মাটির গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করতে থাকে। ভিতরের ফোঁপালটাও সঙ্গে সঙ্গে ততই বড় হতে থাকে। আঁঠি থেকে নলটি বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে 'এনজাইম' নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হতে থাকে। এই এন্‌জাইমের সাহায্যেই ভিতরের হাড়ের মত শক্ত শাঁস গলে মাখমের মত হয়ে যায়। ফোঁপল সেই মাখমের মত পদার্থগুলিকে ধীরে ধীরে শোষণ করে পূর্বোক্ত নলের সাহায্যে মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ ভ্রূণের দেহপুষ্টির জন্য পাঠিয়ে দেয়।

শিকড় গজাবার কিছুদিন পরেও লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতি চারাগাছের বীজ-পত্র নষ্ট হয়ে গেলে তারা আর বেঁচে থাকতে পারে না ; কিন্তু তালের ফাঁপা নলটি একবার পর্যাপ্ত পরিমাণে মাটির নীচে প্রবেশ করতে পারলে তার ভ্রূণের আর বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে না। অঙ্কুর মাটি ফুঁড়ে বাইরে আসবার পূর্বে আঁঠিটি নল থেকে টেনে ছিঁড়ে ফেললেও তাল-শিশু নির্দিষ্ট সময়ে মাটি ফুঁড়ে বাইরে এসে থাকে।

খেজুর-বীজের অঙ্কুরোদগমের সময়ও তালের মত একই রকম কৌশল পরিলক্ষিত হয়। খেজুরের বীজও অতি কঠিন আবরণে আবৃত। এটি দেখতে সরু এবং প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা। একদিকে লম্বালম্বিভাবে চেরা। দেখে বোধ হয় যেন ঐ লম্বালম্বি কাটা দাগের মধ্য দিয়েই এদের অঙ্কুর বের হয়ে আসে ; কিন্তু তা নয়। আঁঠিটি অবশ্য মাটির উপরেই পড়ে থাকে এবং সময়মত একটু জল পেলেই কাটা দাগের বিপরীত দিক থেকে যেন খুব সরু একটি ছিপি খুলে শিকড়ের মত একটা লম্বা নল বের হয়ে আসে। শিকড়ের মত এই নলটি অতি দ্রুত বাড়তে বাড়তে সুবিধামত নরম মাটির নীচে ঢুকে পড়ে। তালের ভ্রূণের মত এদের ভ্রূণটিও ঐ সরু মুখ নলটির ভিতরেই অবস্থান করে। ভ্রূণসমেত নলটি মৃত্তিকাভ্যন্তরে কিছুদূর অগ্রসর হলেই ভ্রূণের গোড়ার দিক্ থেকে একটি কি দুটি মূল শিকড় বের হয়ে আরও নীচে চলে যায়। শিকড় বড় হলে অঙ্কুরটি নলের ভেতরে ঊর্ধ্বদিকে বাড়তে বাড়তে তার আবরণ ছিন্ন করে ফেলে এবং সেখান থেকে শলাকার মত সূচাগ্র পত্র মাটির উপর প্রেরণ করে, মোটের উপর তাল ও খেজুর এই উভয় জাতীয় বৃক্ষের অঙ্কুরোদগমে বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। তাল খেজুর প্রভৃতি গাছ যেমন প্রকাণ্ড ও লম্বা হয় তাতে তাদের চারাগুলিকে এইরূপ দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, ঝড়ঝাপটা

সহ্য করে কিছুতেই খাড়া হয়ে দাঁড়াবার উপায় থাকত না। কত যুগযুগান্তের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে ক্রম-পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্ষার জন্য তারা যে উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে, তা ভাবলে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে থাকতে হয়।

নারিকেল গাছ তাল, খেজুর প্রভৃতি উদ্ভিদের মত হলেও তাদের অঙ্কুরোদগম হয় অতি সাধারণ উপায়ে। প্রথমাবস্থায় এরা বোধ হয় সমুদ্রোপকূলবর্তী নোনা স্থানসমূহেই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বংশবিস্তারের জন্য প্রধানত জলস্রোতের উপরই নির্ভর করত। আধুনিক সময়ে অবশ্য প্রয়োজনবোধে কৃত্রিম উপায়ে মানুষ এদের বংশবৃদ্ধির সুবিধা করে দিয়েছে। পরিপক্ক নারিকেল বোঁটা খসে জলের উপর পড়ত বা জলোচ্ছ্বাসের সময় দূর-দূরান্তরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের বংশবিস্তারের সহায়তা করত। নারিকেলের উপরে ছোবড়ার আবরণ না থাকলে এরূপ ব্যাপার কখনও সম্ভব হত না। এই ছোবড়া যেমন তাদিগকে জলের উপর ভাসিয়ে রেখে দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বার সুবিধে করে দেয়, তেমনই আবার অভ্যন্তরস্থ বৃক্ষশিশু অঙ্কুরিত হবার পর তাকে দৃঢ়ভাবে মৃত্তিকাসংলগ্ন হয়ে সুপ্রতিষ্ঠ হবার জন্য সাহায্য করে থাকে। হয়ত এরূপ সুবিধার জন্যই তাদের তাল-খেজুরের মত অঙ্কুরোদগমের ব্যাপারে এত কৌশল আয়ত্ত করতে হয় নাই। ছোবড়ার নীচে নারিকেলের খোলের মুখের দিকের নরম অংশটি ঠেলে খুব শক্ত একটি অঙ্কুর বের হতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে খোলের অভ্যন্তরে বাইরের অঙ্কুরের সঙ্গে সংলগ্নভাবে একটি গোলাকার ফোঁপল আত্মপ্রকাশ করে। অঙ্কুরটি ছোবড়ার বাইরে আসবার পূর্বেই তার মধ্যে বেশ মোটা মোটা শিকড় চালাতে থাকে। বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প অথবা আর্দ্র স্থান থেকে ছোবড়া কিছু কিছু জল শোষণ করে নিতে পারলে এই নবজাত শিকড়গুলির পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হয়। শুষ্ক থাকলেও নারিকেলের শাঁসে যে-পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত থাকে তাতে অঙ্কুর ও শিকড় উভয়েই নিশ্চিন্তে বর্ধিত হতে পারে। এদেরও অঙ্কুরোদগমের সময় ভিতরে এক প্রকার 'এনজাইম' উৎপন্ন হয় এবং তার সাহায্যে শক্ত শাঁস মাখমের মত নরম হয়ে যায়। ফোঁপল তা শুষে নিয়ে বৃক্ষশিশুটিকে পোষণ করতে থাকে। নারিকেল-চারাটি ফোঁপলের সঙ্গে প্রায় ⅛ ইঞ্চি মোটা এবং প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা বোঁটায় সংলগ্ন থাকে। এই বৃন্তটি নারিকেলের খোলের মুখে ছিপির মত এঁটে থাকে। এতে বাইরের বাতাসের সঙ্গে খোলের অভ্যন্তরে কোনই সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু চারাটিকে ধরে একটু জোড়ে মুচড়ে দিলেই ছিপিটা আল্গা হয়ে যায় এবং ফোঁপলসমেত ঘুরতে থাকে। এতে গাছ বা ফোঁপলের কোন অনিষ্ট না হলেও বাইরের বাতাস ভেতরে ঢুকতে পেয়ে নারিকেলের অভ্যন্তরস্থ শাঁস ও জল নষ্ট করে ফেলে; কাজেই গাছটি খাদ্যাভাবে আর বাড়তে পারে না। অবশ্য ছোবড়া ছাড়িয়ে ফেললেই এরূপ অবস্থা ঘটতে পারে। ছোবড়ার মধ্যে গাছ অঙ্কুরিত হলে নারিকেল-চারাকে কখনই এরূপভাবে আল্গা করে দেওয়া সম্ভব হয় না।

তাল, খেজুর, নারিকেল প্রভৃতি গাছগুলির আকৃতি বহুলাংশে এক ধরণের হলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থা-বৈচিত্র্যের ফলেই বোধ হয় এদের অঙ্কুরোদগম-প্রণালীতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন অবস্থার চাপে পড়ে এরা বিভিন্ন রকমের অঙ্কুরোদগমের কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। বালুকাময় ক্ষেত্রই বোধ হয় খেজুরগাছের আদি লীলাভূমি। এই কারণেই খুব সম্ভব মৃত্তিকার নিম্নস্তর থেকে রস শোষণ এবং সুদৃঢ় মাটিতে গোড়াপত্তন করবার জন্য এরূপ অদ্ভুত উপায়ে বীজ থেকে ভ্রূণকে স্থানান্তরিত করে ভূগর্ভে প্রোথিত করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল। তালগাছ বোধ হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনে কোন কঠিন মৃত্তিকাস্তৃত ভূখণ্ডে তাদের আদি উপনিবেশ স্থাপনে কৃতকার্য হয়েছিল ; তার ফলে অঙ্কুরের পক্ষে মৃত্তিকা ভেদ করে অতি নিম্নে শিকড় চালাবার পন্থা খুব সহজ ছিল না। অথচ শিথিল ভিত্তিতে গোড়াপত্তন করলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। কাজেই অঙ্কুরোদগমের জন্য তাকে পূর্বোক্ত উপায়ই অবলম্বন করতে হয়েছিল। নারিকেল জলস্রোতে ভেসে গিয়ে তীরবর্তী কোন নরম মাটিতে আটকে অঙ্কুর বের করত বলে অতি সহজেই তার পরিপুষ্ট শিকড় গুলিকে মাটির গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়ে দিতে সমর্থ হত। এই জন্যই ভবিষ্যৎ বীজাঙ্কুরের প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে অন্য কোন কৌশল অবলম্বন করতে হয় নাই।

(প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫)

উদ্ভিদের পরাগনিষেক-প্রক্রিয়ার কৃত্রিম উপায়

প্রজনন-ব্যাপারে উদ্ভিদ ও প্রাণী সাধারণতঃ একই নিয়মে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফুলই উদ্ভিদের প্রজনন-যন্ত্র। ফুলের আকৃতি ও প্রকৃতিগত পার্থক্য থেকেই উদ্ভিদের স্ত্রী-পুরুষ নির্ণীত হয়ে থাকে। প্রাণিজগতের ন্যায় উদ্ভিদজগতেও স্ত্রী ও পুং প্রজননকোষ সাধারণতঃ বিভিন্ন গাছে অথবা একই গাছে বিভিন্ন ফুলে পরিপুষ্ট হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই ফুলের ভিতর বিভিন্ন অঙ্গে স্ত্রী ও পুং প্রজনন-কোষ পৃথক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তাল, পেঁপে প্রভৃতি ফলের স্ত্রী ও পুরুষ গাছ সম্পূর্ণ পৃথক। এদের পুরুষ গাছে পুং-পুষ্প এবং স্ত্রী-গাছে স্ত্রী-পুষ্পই ফুটে থাকে। কখনও কখনও এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হলেও তা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এক জাতের তাল গাছ প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় তাতে তাল ফলে না, কেবল কতকগুলি জটা বের হয়। এই জটার গায়ে ক্ষুদ্রাকৃতি অসংখ্য ফুল ফুটে থাকে। এরাই তালের পুং-পুষ্প। যে-গাছে তাদের কাঁদি নামে তাই স্ত্রী-জাতীয় গাছ। পুং-পুষ্প না থাকলে তালগাছে তাল ফলত না। ঝিঙে, পটলেরও সাধারণতঃ স্ত্রী-পুরুষজাতীয় বিভিন্ন উদ্ভিদ দেখা যায়; অবশ্য অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে। লাউ, কুমড়া প্রভৃতি ফলের স্ত্রী ও পুং পুষ্প একই গাছে বিভিন্ন অঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। গাছের গোড়ার দিকে প্রত্যেক পত্রগ্রন্থি থেকে প্রথমে এক-একটি পুং-পুষ্প বের হয়, পরে ডগার দিক থেকে স্ত্রী-পুষ্প আত্মপ্রকাশ করে। আনারস, বেগুন, কলা প্রভৃতির স্ত্রী ও পুং কোষ একই ফুলে সম্মিলিতভাবে জন্মে থাকে। পুরুষ ফুলের অভ্যন্তরস্থ এক বা একাধিক বোঁটা বা শুঁয়োর আকার দণ্ডের অগ্রভাগে অতি সূক্ষ্ম চা-খড়ি বা হলুদ চুর্ণের মত এক প্রকার পদার্থ লেগে থাকতে দেখা যায়। এদিগকে ফুলের রেণু বা পরাগ বলে। এরাই ফুলের পুং-প্রজনন কোষ। পুং-পুষ্পের অভ্যন্তরস্থ বোঁটা বা শুঁয়োর আকৃতিবিশিষ্ট যন্ত্রগুলিকে পরাগকেশর এবং স্ত্রীপুষ্পের অভ্যন্তরস্থ দণ্ডগুলিকে গর্ভকেশর বলে উল্লেখ করেছি। বিভিন্ন জাতীয় স্ত্রী-পুষ্পের অভ্যন্তরে বিভিন্ন আকারের গর্ভকেশর থাকে। পুরুষ-ফুলের রেণু কোন গতিকে এর উপর পড়লে এক প্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে তার গায়ে আটকে যায়। এটাই ফুলের পরাগনিষেক-প্রক্রিয়া। স্বাভাবিক ভাবে বিভিন্ন উপায়ে এই পরাগনিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। জল, বাতাস, পিপীলিকা ও মৌমাছি প্রভৃতির সাহায্যে বৃক্ষের পরাগনিষেক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। পরাগ-

নিষেক-প্রক্রিয়ায় প্রাণীদের সাহায্য নেবার উদ্দেশ্য থেকেই না কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুলের মধু, ফলের বাহার ও বৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক নির্বাচনে অভিব্যক্তির ধারানুযায়ী আত্মপ্রকাশ করেছে। সে যাই হোক, প্রজাপতি, মৌমাছি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় কীটপতঙ্গ মধুর লোভে ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়। মধু আহরণ করবার সময় পুং-পুষ্পের রেণু তাদের গায়ে লেগে যায়। সেই অবস্থায় এরা যখন স্ত্রী-ফুলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন আঠালো পদার্থ সংযুক্ত পিণ্ডাকৃতি গর্ভকেশরে রেণু সংলগ্ন হয়ে যায়। সেই সব ফুলের মধ্য থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয় বা যাতে মধু নাই সেই সব ফুলে সাধারণত বাতাসের সাহায্যে পরাগনিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন জাতীয় জলজ উদ্ভিদের স্ত্রী ও পুং পুষ্প একই সময়ে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং জলের ঠিক উপরিভাগে কতকটা অর্ধনিমজ্জিত ভাবে প্রস্ফুটিত হয়। তখন পুং-পুষ্পের রেণু জলে ভেসে স্ত্রী-পুষ্পের গাত্রসংলগ্ন হয়ে থাকে।

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গাছে যথেষ্ট পরিমাণ ফল ধরা সত্ত্বেও তারা পরি-পুষ্ট হয় না অথবা অকালে ঝরে পড়ে। স্বাভাবিকভাবে পরাগনিষিক্ত না হওয়ার ফলেই এরূপ ঘটে থাকে। আনারস ও কাঁঠালের কোষসমূহ এবং লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুন প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের স্ত্রীজাতীয় স্ত্রী-পুষ্প যথোপযুক্তভাবে পরাগ-নিষিক্ত না হলে কোন কোন অংশ পরিপুষ্ট এবং কোন কোন অংশ অপরিপুষ্ট থেকে যায় ; তাতে গঠনসৌষ্ঠব লক্ষিত হয় না। কৃত্রিম উপায়ে পরাগ নিষেক করলে অনেক স্থলেই সুফল পাওয়া যেতে পারে, নির্বাচন-প্রক্রিয়া ও কৃত্রিম উপায়ে পরাগ-সঙ্গম ঘটিয়ে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ-যাদুকর লুথার বার্বাঙ্ক উদ্ভিদজগতের যে কি অঘটন ঘটিয়েছেন তা উদ্ভিদ ও কৃষি-বিজ্ঞানে অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। ব্যাপকভাবে না হউক, অন্তত খণ্ড খণ্ড ভাবেও এই প্রণালী অনুসরণ করলে আমাদের দেশে কৃষিকার্যে যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত হত।

গাছে ফল ধরলে কি উপায়ে তাকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে পরি-পুষ্ট করে তোলা যেতে পারে, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছ নিয়েই প্রথমে কাজ আরম্ভ করা সুবিধাজনক ; কারণ এদের ফুলগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের হয়ে থাকে। বিশেষত; স্ত্রী ও পুং পুষ্পের পার্থক্যও অতি সহজেই বুঝতে পারা যায়। কুমড়াগাছে প্রথম যে ফুল ফুটতে আরম্ভ করে, সেগুলি পুং-পুষ্প। পুং-পুষ্প সরু লম্বা বোঁটার ডগায় কলকের মত ফুটে থাকে। ফুলের অভ্যন্তরে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হলদে রঙের একটি দণ্ড থাকে। তার গায়ে হাত দিলেই দেখতে পাওয়া যাবে, হলদে রঙের এক প্রকার মিহি চূর্ণ হাতের সঙ্গে লেগে আছে। এটাই কুমড়া ফুলের রেণু বা পরাগ। স্ত্রী-পুষ্পের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং বোঁটা অনেক ছোট কিন্তু মোটা। বোঁটার প্রান্তভাগে ছোট্ট একটি কুমড়া নিয়ে ফুল বের হয়। এই ছোট্ট কুমড়াটির শেষ প্রান্তেই স্ত্রী-পুষ্প ফুটে থাকে। স্ত্রী-পুষ্পের অভ্যন্তরে হলদে অথবা লাল রঙের মোটা

মোটা কয়েকটি পিণ্ডাকার পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। পিণ্ডগুলির গায়ে হাত দিলেই বুঝা যাবে এরা এক প্রকার চট্‌চটে আঠালো পদার্থে আবৃত। যে কোন গাছ থেকে একটি পুংপুষ্প বোঁটাসমেত ছিঁড়ে নিয়ে ফুলের পাপড়িগুলি ফেলে ভিতরের হলদে দণ্ডটি বোঁটার সঙ্গেই রেখে বোঁটায় ধরে অতি ধীরে ধীরে স্ত্রী-পুষ্পের অভ্যন্তরস্থ পিণ্ডাকৃতি স্থানগুলিতে ছুইয়ে দিলেই ঐ রেণু তাদের গাত্র-সংলগ্ন হয়ে যাবেই। এটা পরাগসঙ্গম-প্রক্রিয়া। কুমড়া-ফুল প্রাতঃকালে ফুটে থাকে এবং প্রায় তিন-চার ঘণ্টা পর্যন্ত সতেজ থাকে, দিবালোকের প্রখরতা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই এটি ক্রমে মুদিত হয়ে পড়ে। কাজেই নিস্তেজ হয়ে ঢলে পড়বার পূর্বেই পরাগনিষেক করতে হয়। ফুল ফুটবার পর প্রায় ঘণ্টাখানেক সময়ের মধ্যে এইরূপে পরাগসঙ্গম করিয়ে দিলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সুফল লাভ হবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় পুষ্পই ফুটবার সময় ঊর্ধ্বমুখী হয়ে থাকে। পরাগসঙ্গমের পর বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে মুদ্রিত ফুলসমেত ছোট্ট কুমড়াটি ক্রমেই যেন নীচের দিকে বেঁকে আসছে। প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা পরে বোঁটাসমেত ফলটিকে পরিষ্কার ভাবে নিচের দিকে ঝুলে পড়তে দেখা যাবে। রেণু লাগিয়ে দিবার পর ফলটি এরূপে নিচের দিকে ঝুলে পড়লে বুঝতে পারা যাবে—যথাযথ ভাবেই পরাগ নিষিক্ত হয়েছে এবং ফল অতি দ্রুত গতিতে পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে। ফুল না ছিঁড়েও পাখীর পালক বা কোমল তুলি দিয়ে পুং-পুষ্প থেকে রেণু তুলে স্ত্রী-পুষ্পে লাগিয়ে দিলেও কাজ চলবে।

একবার বিক্রমপুর* অঞ্চলে এক কৃষকের কৃষিক্ষেত্র দেখতে গিয়েছিলাম। তখন শীতের মধ্যভাগ। কিছু দিন ধরে রোজই সকালবেলা কুয়াশা হচ্ছিল। দেখলাম অন্যান্য শাকসব্জী ব্যতিরেকে প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা ও প্রায় পনর হাত চওড়া এক খণ্ড জমিতে অনেক কুমড়াগাছ জন্মেছে। এই জমিখণ্ডে কেবল কুমড়াগাছই রোপণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক গাছই সবল ও পরিপুষ্ট এবং লতাপাতা বিস্তার করে সমগ্র ক্ষেত্রখানি ঢেকে ফেলেছিল। কুমড়াসহ স্ত্রী-পুষ্প এবং অজস্র পুং-পুষ্প ফুটে রয়েছে দেখতে পেলাম। কিন্তু জমির মালিক বলল, ফুল ফুটলে কি হবে—এপর্যন্ত একটা কুমড়াও ধরে নাই, সবই অকালে ঝরে পড়ছে। তখন সমস্ত খবর নিয়ে বুঝলাম—যে-সময় ফুল ফোটে সেই সময় এবং তার পর অনেকক্ষণ অবধি কুয়াশা থাকায় একটাও মৌমাছি বা অন্য কোন কীটপতঙ্গ বের হয় না। আরও অনুসন্ধান করে দেখলাম, অনেক বেলায় মৌমাছিরা ফুলের মধু খেতে আসে—তখন ফুলের সতেজ অবস্থা থাকে না। তখন আমি কতকগুলি স্ত্রী-পুষ্প চিহ্নিত করে তাতে পুং-পুষ্পের রেণু লাগিয়ে দিলাম। পরদিন গিয়ে দেখলাম সকলগুলি ঘুরে মাটির দিকে নেমেছে। তার পর তাকে রেণু প্রয়োগ করবার প্রণালী দেখিয়ে দিয়ে আসলাম। কিছুদিন বাদ গিয়ে শুনলাম কৃত্রিম উপায়ে

* বর্তমানে বাংলাদেশের ঢাকা জেলায়।

পরাগনিষেক করে সে অতি আশ্চর্য ফল লাভ করেছে। প্রত্যেকটি গাছে দুই-একটি ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ কুমড়াই বেশ বড় হয়েছে।

কলার ফুল উভলিঙ্গ, স্ত্রী ও পুং-পুষ্প একই সঙ্গে থাকে। স্ত্রী-গর্ভকেশর দিয়াশলাইয়ের কাঠির মত। মাথায় ছোট্ট একটি গোলাকার পদার্থ আছে তা এক প্রকার আঠালো পদার্থে আবৃত। পুংকেশরের রেণু ফলের শেষ প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র খোলায় আবৃত থাকে। রেণু পরিপক্ক হলে আপনা আপনি নিচের দিকে ঝরে পড়বার সময় গর্ভকেশরের আঠালো পদার্থে লেগে যায়। অনেক সময় বোলতা বা মৌমাছিদের দ্বারাও পরাগসঙ্গম ঘটে থাকে।

কাঁঠালের স্ত্রী ও পুং পুষ্প একটু অদ্ভুত ধরণের। যন্ত্রসাহায্য-ব্যতিরেকে এদের ফুল মোটেই দৃষ্টিগোচর হয় না। যে ফলগুলি বেশ বড় বড় আকারের ও প্রায়শই গাছের নীচের দিকে ফলে থাকে, তারাই স্ত্রীপুষ্পসমন্বিত কাঁঠাল। তাদের গায়ের কাঁটাগুলি বেশ উন্নত ও সুতীক্ষ্ণ। বিশেষ মনোযোগ সহকারে দেখলে প্রত্যেকটি কাঁটার মাথায় সূক্ষ্ম শুঁয়োয় মত এক-একটি ফিকে সবুজ রঙের তন্তু দেখা যাবে। এরাই কাঁঠালের গর্ভকেশর। প্রত্যেকটি কাঁটাই এক-একটি আলাদা আলাদা ফুলের অংশবিশেষ। সাধারণত গাছের অনেক উপরের অথবা-স্ত্রী-পুষ্পের বোঁটার উপরের দিকে ভিন্ন রকমের এক প্রকার সরু বোঁটা-সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁঠাল দেখা যায়। এদের গায়ের কাঁটাগুলি উন্নত নয়, অপেক্ষাকৃত মসৃণ। এরাই কাঁঠালের পুং-পুষ্প। এদের গায়ে ফিকে হলদে রঙের এক প্রকার মিহি চূর্ণ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি পুং-পুষ্পের রেণু। রেণু পরিপক্ক হলেই ঝরে নিচে পড়ে এবং নিম্নস্থিত স্ত্রী-পুষ্পে সংলগ্ন হয়ে পরাগসঙ্গম হয়ে থাকে। পুং-পুষ্পগুলি ছিঁড়ে নিয়ে রেণুগুলি স্ত্রী-পুষ্পের গায়ে ঝেড়ে দিলে সকল কোষগুলি সমানভাবে পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।

আনারসের গায়ে যে অসংখ্য কাঁটা থাকে তার মধ্যে ছোট ছোট নীল রঙের ফুল ফুটে থাকে। ফুলগুলি উভলিঙ্গ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক জাতীয় পিপীলিকা মধুর লোভে আনারসের গায়ের উপর ঘোরাফেরা করে। রেণু তাদের গাত্রসংলগ্ন হয়ে ফুলের গর্ভকেশরে লেগে যায় এবং প্রত্যেকটি কাঁটার চতুর্দিকস্থ স্থানগুলি পরিপুষ্ট হয়ে থাকে।

(প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩৪৫)

কৃত্রিম উপায়ে অর্কিড ফুলের বৈচিত্র্য উৎপাদন

****

জীবজগতে বৈচিত্র্য উৎপত্তির কারণগুলির মধ্যে নির্বাচন এবং মিউটেসন জৈব বিবর্তনের সহায়ক। তোমরা হয়তো জান যে, অনেকদিন ধরেই মানুষ কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ বহু মিউট্যান্ট উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছে। আজ অর্কিড ফুলের মিউটেসন উৎপাদনে একজন উদ্ভিদ-বিশেষজ্ঞের কৃতিত্বের কথা বলব। লুসিয়েন রিচ্‌লার সাধারণ অর্কিডের বংশানুক্রমিক স্থায়ী গুণবিশিষ্ট মিউট্যান্ট ফুলের সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে অন্যান্য অর্কিডের রেণু-নিষেক (ফুলের রেণু স্ত্রী-ফুলের গর্ভকেশরে লাগিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে রেণু-নিষেক বলা হয়)। সতেরো বছরে অক্লান্ত পরিশ্রমে বিভিন্ন রকমের যেসব অতিকায় এবং সুদৃশ্য অর্কিড ফুল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছেন তা সত্যসত্যই এক অপূর্ব বিস্ময়ের বস্তু। অর্কিড তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। কারণ আমাদের দেশে অর্কিডের অভাব নেই। যারা দেখনি তারা বড়দের সাহায্যে দেখে নিতে পার; অথবা অর্কিড জিনিসটা কি—জেনে নিতে পার।

কি উপায়ে রিচ্‌লার এ-ব্যাপারে সাফল্য লাভ করেছেন তা বুঝিয়ে বলতে গেলে এ-সম্বন্ধে পূর্ব কথার একটু আলোচনা প্রয়োজন। কেমন করে জীবজগতে (উদ্ভিদ ও প্রাণী) নতুন নতুন বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে আমরা লামার্ক, ডারুইন প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের মতবাদ থেকে জানতে পারি। পারিপার্শ্বিক অবস্থা, খাদ্য এবং অন্যান্য বাহ্যিক প্রভাবে একই জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে থাকে। স্থানবিশেষে অবস্থানের সুযোগে কোন উদ্ভিদ যদি যথেষ্ট সূর্য-কিরণ পায় তাহলে প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে ছায়াতে অবস্থিত সেই জাতীয় গাছের চেয়ে অধিকতর পরিপুষ্ট এবং সতেজ হয়ে উঠবে। সেরূপ, মাটিতে জলীয় অংশ এবং দেহপোষণের উপযোগী অজৈব পদার্থের প্রাচুর্য, পাতা থেকে জলীয় পদার্থ নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, তাপমাত্রা, পার্শ্ববর্তী অন্যান্য উদ্ভিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাভেদে বিভিন্ন রকমের পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ডারুইন যে এসব ব্যাপার লক্ষ্য করেন নি, তা নয়; তবে পরীক্ষামূলক তথ্যের অভাবে অনেক কিছুই অমীমাংসিত রয়ে গেছে। যাহোক, উদ্ভিদ-তত্ত্বান্বেষীরা অনেকেই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন যে, কলম করবার প্রথায় পরিণত বয়স্ক গাছের অংশবিশেষ থেকে উৎপাদিত নতুন গাছের চেয়ে বীজের গাছ অনেকাংশেই সতেজ ও উন্নত হয়ে থাকে। একই গাছের ফুলের মধ্যে রেণু-নিষেকের ব্যবস্থা করলে তা থেকে উদ্ভূত নতুন বংশধর-

দের কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু একই জাতীয় বিভিন্ন গাছের ফুলে রেণু-নিষেক ঘটলে বংশধরেরা অপেক্ষাকৃত সতেজ ও উন্নত হয়ে থাকে। একজাতের বিভিন্ন গাছের ফুলের মধ্যে পরাগ সঙ্গমের ফলে উৎকর্ষ ঘটতে দেখে অনুসন্ধিৎসুদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন জাগলো যে, এক জাতের না হয়ে দূরসম্পর্কিত অথচ সমগণভুক্ত বিভিন্ন ফুলে রেণু-নিষেক ঘটলে আরও বেশি সাফল্য লাভ হবে কিনা। এ-থেকেই ক্রমশ বর্ণসঙ্কর (অসম মিলনের ফল) উৎপাদনের চেষ্টা চলতে থাকে। কিন্তু আপাত-দৃষ্টিতে সাফল্য লভ হলেও এদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেখতে পাওয়া যায় নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ডারুইনের মতবাদ সম্বন্ধে অনুমান ও পরোক্ষ প্রমাণাদির উপর নির্ভর করেই নানারকমের বাদানুবাদ চলছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই এ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহের উপায় উদ্ঘাটিত হয়। এ-সময়েই জীবজগতের বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে এক অপূর্ব তত্ত্বের কথা শুনতে পাওয়া যায়। এই অপূর্ব তত্ত্ব 'মেণ্ডেল নিয়ম' নামে পরিচিত। মেণ্ডেল ছিলেন একজন অদম্য অস্ট্রিয়ান পাদ্রী। প্রাকৃতিক রহস্য জানবার জন্যে তাঁর কৌতূহল ছিল অদম্য। তিনি ডারুইন-প্রবর্তিত মতবাদের সম্বন্ধে সব খবরই রাখতেন এবং বংশানুক্রম সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য নির্ধারণ করবার জন্যে মটর গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। পরীক্ষার ফলে তিনি ডারুইনের সমকালেই কতকগুলো অপূর্ব তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ডারুইন কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে কোন খবরই জানতেন না। যাহোক, বহুকাল পরে দৈবক্রমে তাঁর এই অপূর্ব গবেষণা সম্পর্কিত কাগজপত্র আবিষ্কৃত হয়। একই জাতীয় (species) অথচ রকমারি (varieties) দুটি প্রাণী বা উদ্ভিদের মধ্যে মিলন ঘটলে বংশধরেরা পিতামাতার মধ্যবর্তী একপ্রকার রূপ পরিগ্রহ করে। অনেক সময় এ-ও দেখা যায়—হয় পিতার দিকে নয়তো মাতার দিকে সন্তানের একটু বেশি সাদৃশ্য রয়েছে। কিন্তু একটি লম্বা ও একটি খাটো মটর গাছের ফুলের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে (রেণু-নিষেক করে) মেণ্ডেল দেখলেন, সেই মিলনের ফলে উৎপাদিত বংশধরেরা সবাই লম্বা হয়েছে; অধিকন্তু লম্বা গাছের সবগুলো বৈশিষ্ট্যই তাদের মধ্যে রয়েছে। ডারউইনও এরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলেন; কিন্তু মেণ্ডেল এপর্যন্ত দেখেই ক্ষান্ত থাকেন নি—তিনি আরও অনেকদূর অগ্রসর হলেন। এই লম্বা মটরের বীজ রক্ষা করে বংশানুক্রমে কয়েক পুরুষ পর্যন্ত গাছ উৎপাদন করে দেখলেন যে, তারা কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়মে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। বর্ণসঙ্কর থেকে উৎপাদিত প্রথম পুরুষের বীজে যে গাছ জন্মেছিল তাতে লম্বা মটরের প্রায় সবগুলো বৈশিষ্ট্যই আত্মপ্রকাশ করলো, বটে, কিন্তু কোন গাছই লম্বায় বর্ণসঙ্কর পিতামাতার মধ্যবর্তী অবস্থা পেল না। অথচ সবগুলো একই রকম লম্বা হওয়ার পরিবর্তে কতকগুলো সম্পূর্ণ লম্বা আর কতকগুলো সম্পূর্ণ খর্বাকৃতি গ্রহণ করলো। তাছাড়া এই লম্বা ও খাটো গাছ-গুলোর সংখ্যার অনুপাতও সর্বত্র সমান। প্রত্যেক চারটি গাছের মধ্যে তিনটে লম্বা,

একটি খাটো। এই খাটো ও লম্বা গাছের বীজ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে গাছ উৎপাদন করে দেখা গেল—খাটো গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত সবগুলো গাছই খাটো হয়েছে। তাদের বীজ থেকেও পর পর গাছ উৎপাদন করে দেখা গেল যে, বংশপরম্পরায় সুনির্দিষ্টভাবে তারা খাটোই থেকে যায়। কিন্তু লম্বা গাছের বেলায় এ-নিয়মের অদ্ভুত ব্যতিক্রম দেখা গেল। খাটো গাছের বীজের মত একই নিয়মে গাছ উৎপাদন করা সত্ত্বেও তাদের তিন ভাগের একভাগ বীজ মাত্র লম্বা গাছ উৎপাদনের সক্ষম হলো এবং বংশানুক্রমিক তারা লম্বা গাছই উৎপাদন করতে লাগলো। কিন্তু বাকী তিনভাগের দু-ভাগ বীজ থেকে পুনরায় পূর্বের মত ৩ : ১ অনুপাতে লম্বা ও খাটো গাছ উৎপন্ন হলো। এই খাটো গাছের বীজ থেকে বংশানু-ক্রমে কেবল খাটো গাছ এবং লম্বা গাছের বীজ থেকে পূর্বের মত দু-রকমের গাছ আত্মপ্রকাশ করলো। তাদের এক তৃতীয়াংশ লম্বা এবং বংশানুক্রমে লম্বা গাছই উৎপাদন করে এবং বাকী দুই তৃতীয়াংশ পুনরায় ১, ২, ৩ অনুপাতে লম্বা ও খাটো গাছ সৃষ্টি করে থাকে। ক্রমোন্নতিবাদ অনুযায়ী এ-নিয়মে অবশ্য নতুন জাতি সৃষ্টির রহস্য অনুধাবন করা যেতে পারে, কিন্তু জীবজগৎ (উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়েই) এরূপ মন্থর গতিতে বিবর্তিত হচ্ছে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

যাহোক মেণ্ডেলের পরে হিউগো ডি ভ্রিজ বর্ণসঙ্করের বংশানুক্রম পরীক্ষায় মিউটেসনের অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করে সব সন্দেহের অবসান ঘটান। মিউট্যাণ্ট অকস্মাৎ আবির্ভূত হয় এবং বংশানুক্রমে স্থায়ীভাবে তার বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে থাকে। মিউট্যাণ্ট উৎপাদনে অধুনা আবিষ্কৃত বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ের কথা বাদ দিলেও মোটামুটি উপরিউক্ত নিয়মানুসারেই জীবজগতে বর্ণসঙ্কর ও ইচ্ছানুরূপ বৈচিত্র্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। মেণ্ডেলের পরীক্ষানুসারে নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় স্থায়ী বৈশিষ্ট্য সমন্বিত বর্ণসঙ্কর উৎপাদন সম্ভব হলেও তা যেমনই সময়সাপেক্ষ তেমনই অসুবিধাজনক। কিন্তু বর্ণসঙ্কর উৎপাদিত হওয়ার পর প্রথম পুরুষ থেকেই তাকে স্থায়ী করবার ব্যবস্থা অবলম্বন করলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কাজে লাগানো যেতে পারে। কোন একটি ফুলের সঙ্গে নির্বিচারে বিজাতীয় যে কোন ফুলের রেণু-নিষেক সাফল্য লাভ করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্ন রকমারি হলেও সমগণভুক্ত পরস্পরের সঙ্গে মিলন ঘটতে পারে। এরূপ মিলনের ফলে উৎপন্ন বীজ থেকে বর্ণসঙ্কর গাছ পাওয়া যাবে। তাদের ফুলে পিতামাতা উভয়েরই বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করতে পারে। বংশানুক্রমে এই বৈশিষ্ট্য স্থায়ী করতে হলে মেণ্ডেলের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচন-প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে 'কলম' করার প্রণালী অনুসরণ করা। বীজ থেকে গাছ উৎপাদিত হলে কালক্রমে যেসব পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করবার সম্ভাবনা, কলমে সেরূপ ঘটবার আশঙ্কা কম। কাজেই এই উপায়েও বর্ণসঙ্করের গুণাবলী স্থায়ী রাখা সম্ভব ; কিন্তু সর্বক্ষেত্রে কলম করা সম্ভব নয়।

মিউটেসন ও বর্ণসঙ্কর প্রবর্তিত যে সব প্রাকৃতিক তত্ত্ব আলোচিত হলো লুসিয়েন রিচ্‌লার তদনুসরণে অর্কিডের অভিনব ফুল উৎপাদনে অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। দুটি মিউট্যাণ্ট অর্কিড থেকে তিনি বহুবিধ বিচিত্র ফুল উৎপাদন করেছেন। ছোট ও বড় দু-জাতের ক্যাটলিয়া লেবিয়াটার সঙ্গে অন্যান্য বহু জাতীয় সাধারণ অর্কিডের পরাগ-সঙ্গম ঘটিয়ে তিনি অপূর্ব অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর এই মিউট্যাণ্ট ক্যাটলিয়ার গাছ দুটি অনেককাল ধরে একই রকমের ফুল উৎপাদন করেছে ; কখনও কোন ফুলে কিছুমাত্র পরিবর্তন দেখা যায় নি। বড় ফুলটির পাঁচটি পাপড়ির সবগুলোই বড়। ছোট ফুলটির পাপড়ির সংখ্যা সাত ; এর তিনটি বড় চারটি ছোট। এই হলো ফ্ল দুটির বৈশিষ্ট্য। পূর্বেই বলেছি—কেবলমাত্র নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জনই নয়, বৈশিষ্ট্যকে বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট ভাবে সম্প্রসারিত করাই মিউট্যাণ্টের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তিনি প্রধানত দু-জাতের বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের চেষ্টা করেন। প্রথম উপায়— পিতামাতার যে কোন একটি বড় মিউট্যাণ্ট ক্যাটলিয়া। দ্বিতীয় উপায়—পিতামাতা দুটিই মিউট্যাণ্ট ; একটি বড় অপরটি ছোট ক্যাটলিয়া (উভয় জাতীয় স্ত্রী ও পুং-পুষ্পের বিভিন্ন যোগাযোগে আরও রকমারি ফ্লের আবির্ভাব সম্ভব)। তাছাড়া বড় ক্যাটলিয়ার দুটি ফ্লের মধ্যে তিনি পরাগ-সঙ্গম ঘটিয়েছিলেন। প্রথমোক্ত উপায়ে তিনি তিন রকমের ফ্ল পেয়েছিলেন। একজাতীয় পিতৃগুণপ্রাপ্ত, একজাতীয় মাতৃগুণপ্রাপ্ত এবং অপরটি মধ্যম। মধ্যমটিই দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয় উপায়ে তিনি চার রকমের বৈচিত্র্য উৎপাদনে সমর্থ হন। এদের মধ্যে একজাতীয় —সাধারণ আকৃতির, একজাতীয়—পিতৃগুণপ্রাপ্ত, অল্প কয়েকটি যুগ্ম আকৃতি-বিশিষ্ট, এবং চতুর্থটি—সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ধরনের। কতকগুলো গাছে আবার এক বোঁটায় দুটি বিভিন্ন আকৃতির ফ্লও ফ্টেছিল। কয়েকটি গাছে ভিন্ন ভিন্ন বছরে বিভিন্ন ফ্ল ফ্টতে দেখা যেত। তিনি এগুলোকে বলেছেন—পরিবর্তনশীল মিউট্যাণ্ট। যাহোক রিচ্‌লারের কৃতিত্ব কেবল ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উপকরণ যুগিয়েছে।

(জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১)

ঔষধ প্রয়োগে অতিকায় ফুল ও ফল উৎপাদন

****

বিধাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যিনি নূতন সৃষ্টি প্রকরণে মনোনিবেশ করেছিলেন, নারকেলের মত অপূর্ব ফল নাকি সেই অদ্ভুতকর্মা বিশ্বমিত্রেরই সৃষ্টি। কি উপায়ে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছিলেন, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয় না। তার পর শোনা যায়, বেণরাজার কথা। ঘোড়া, গাধার সংযোগে খচ্চর উৎপন্ন হতে দেখে তিনি নাকি মনুষ্যসমাজে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। পরবর্তী যুগের শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের ব্যবস্থা দেখে মনে হয় সমাজবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ বিষয়ে অনেকটা অগ্রসর হলেও বংশানুক্রমের মূল তত্ত্বানুসন্ধানে কেউই আগ্রহান্বিত হন নাই। যাহা হউক, পুরাকালের কথা বাদ দিয়ে, সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের প্রকৃত রহস্য অবগত হবার জন্য বর্তমান কালের মনীষিগণের ধারাবাহিক অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টা ও তাতে অসাধারণ সাফল্যের বিষয় চিন্তা করলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকতে হয়। ডারুইন, লামার্ক, ডি-ভ্রিজ, মেণ্ডেল প্রমুখ মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও বংশানুক্রম সম্বন্ধে প্রকৃতির অনেক গুপ্ত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। তবে এই সকল মনীষীর কর্মপ্রচেষ্টা মুখ্যত অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে কোন কোন বিষয়ে এই নবলব্ধ জ্ঞান ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তা কতকটা গতানুগতিকতাতেই পর্যবসিত হয়েছিল। উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তার যে কতদূর উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে ব্যবহারিক বিজ্ঞানে তার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ-তরঙ্গের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হার্টজ্ কর্তৃক ম্যাক্সওয়েল তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণিত হবার পর সর্বশেষে মার্কনি যখন অপূর্ব সফলতার সঙ্গে তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সমর্থ হলেন, সমগ্র জগৎ দেখে তখন বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। সেরূপ, উদ্ভিদ ও জীববিষয়ক অজ্ঞাত রহস্যসমূহ অধিগত হবার পর উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এমন এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, যিনি তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি-নৈপুণ্যের ফলে 'উদ্ভিদের যাদুকর' রূপে চিরকাল সকলের চিত্তপটে জাগরূক থাকবেন। এস্থলে তাঁর অদ্ভুত কর্মদক্ষতার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।

এই উদ্ভিদ যাদুকরের নাম লুথার বার্বাঙ্ক। ছেলেবেলা থেকেই উদ্ভিদের উপর বার্বাঙ্কের বিশেষ একটা আকর্ষণ লক্ষিত হত। পাঠ্যাবস্থায় সহপাঠীরা যখন খেলাধুলায় ব্যাপৃত হত তিনি তখন উদ্ভিদ তথ্যানুসন্ধানে মনোনিবেশ করতেন। পাঠ্যাবস্থা অতিক্রম করবার পর কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেও অবসর পেলেই তিনি

গাছপালা নিয়ে সময় কাটাতেন। হঠাৎ এক দিন নজরে পড়ল—একটা গোল-আলুর গাছে ফল ধরেছে। ফলটি পরিপক্ক হলে তিনি তা যত্ন করে রেখে দিলেন। পর বৎসর সেই বীজ রোপণ করে উৎকৃষ্টতর ফসল উৎপাদন করতে সমর্থ হলেন। সেই সময়ে রোগবীজাণুর ও অন্যান্য কারণে উৎকৃষ্ট নমুনার গোল আলু উৎপাদনে নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছিল। অবশেষে প্রকৃত প্রস্তাবে গোল আলুর দুর্ভিক্ষই দেখা দিল। সেই সময়ে বার্বাঙ্ক তাঁর নতুন আলুর বীজ ১৫০ ডলার মূল্যে বিক্রয় করে দেন। সেই বীজ থেকে ক্রমশ উকৃৎষ্টতর গোল আলু চাষ আমেরিকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তার পরে তিনি অপূর্ব উদ্ভাবনী শক্তি-বলে সর্বোৎকৃষ্ট এক জাতীয় গোল আলু উৎপাদন করেন। এটিই বর্তমানে 'বার্বাঙ্ক-পোটেটো' নামে সর্বত্র পরিচিত। ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনি কার্যে ইস্তফা দিয়ে ক্যালিফোর্ণিয়ায় গমন করেন। সেখানে কতকটা জমি সংগ্রহ করে নানা প্রকার গাছ-গাছরা নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেন। এখানেই তিনি গাছের কলম উৎপাদনের অভিনব ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সুনাম ও অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। আর্থিক অবস্থা পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নূতন ধরনের ফল ও ফুল উৎপাদনে মনোনিবেশ করেন। সৃষ্টি-বৈচিত্র্য ও বংশানুক্রম সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করে তিনি কৃত্রিম উপায়ে পরাগনিষেক-প্রক্রিয়ার সাহায্যে উদ্ভিদের বিবিধ বর্ণসংকর উৎপাদনে কৃতকার্য হন। সমগোত্রীয় একরকম ফুলের সঙ্গে অন্যরকম ফুলের পরাগ সঙ্গম ঘটিয়ে তিনি এমন কতকগুলি ফুল ও ফল উৎপাদন করলেন, পৃথিবীতে পূর্বে যার কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমরা যাকে "প্রকৃতির খেয়াল" বলি উদ্ভিদ-জগতে সেরূপ দৃষ্টান্ত প্রায়ই নজরে পড়ে। "প্রকৃতির খেয়ালে"র এই অদ্ভুত নমুনা থেকে নির্বাচন-কৌশলে বার্বাঙ্ক এমন সকল গাছপালা, ফলমূল উৎপাদন করলেন যারা আজও বংশানুক্রমে একইভাবে উৎপাদিত হচ্ছে।

তাঁর কৃতকার্যের পুরস্কার স্বরূপ বিখ্যাত কার্ণেগী ইনস্টিটিউট ১৯০৫ সাল থেকে পরীক্ষা কার্যের সহায়তার জন্য তাঁকে বার্ষিক একটা মোটা টাকার বৃত্তি নির্ধারিত করে দেন। নিরুদ্বেগে তখন তিনি পরীক্ষাকার্য চালাতে থাকেন। সেকালের বিশ্বামিত্র একমাত্র নারকেল ফলই সৃষ্টি করেছিলেন আর এই কলির বিশ্বামিত্র প্রায় লক্ষাধিক নূতন ফলমূল সৃষ্টি করে বিধাতারও বোধ হয় তাক্ লাগিয়ে দিয়েছেন। ৩০,০০০ বিভিন্ন জাতীয় কুল, ৬০,০০০ রকমারি পিচ ও অমৃতফল ৫,০০০ রকমারি বাদাম, ৫০ রকমের বিভিন্ন জাতীয় আপেল ও ন্যাসপাতি এবং হাজার হাজার সুদৃশ্য ফুল ও গাছপালা সৃষ্টি করে তিনি খোদার উপর খোদকারী করেছেন। এক সময়ে আমেরিকার মনসা-গাছ, বিষাক্ত কাঁটার জন্য মানুষ বা জীবজন্তুর কোন কোন উপকারে লাগা দূরে থাক, কেবলমাত্র একটা বিপজ্জনক পদার্থ বলে বিবেচিত হত। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বার্বাঙ্ক তা থেকে এমন এক প্রকার মনসা গাছ উৎপাদন করলেন যার গায়ে একটি মাত্রও কাঁটার চিহ্ন নেই। এই

কাঁটাশূন্য মনসা গাছ এখন গৃহপালিত পশুদের খাদ্যরূপে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। কুল ও বাদাম গাছের ফুলে কৃত্রিম উপায়ে পরাগানিষেক করে—কুলও নয় বাদামও নয় অথচ উভয় জাতীয় ফল অপেক্ষা অধিকতর সুস্বাদু, আঁঠীশূন্য বৃহদাকৃতির এক প্রকার ফল উৎপাদন করে তার নাম দিয়েছেন— Plumcot অর্থাৎ Plum + Apricot = Plumcot. এইরূপ আরও কত কিছু অভিনব পদার্থ উৎপাদন করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কলম বাঁধবার অভিনব পন্থা, নির্বাচন কৌশল ও কৃত্রিম উপায়ে পরাগানিষেক প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সাহায্যে বার্বাঙ্ক তাঁর অভিনব সৃষ্টিকার্যে সাফল্য অর্জন করেছেন ; কিন্তু বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকেরা বৃক্ষদেহে ভেষজ প্রয়োগ করে আরও সহজ উপায়ে ফুল-ফলের আকৃতি, প্রকৃতি পরিবর্তন করতে সমর্থ হয়েছেন। বার্বাঙ্কের অভিনব সৃষ্টি পূর্বাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহের দিক থেকে কোন নূতন রহস্য নয়। এটি পূর্বাবিষ্কৃত তথ্যসমূহের পরিপূরক মাত্র। বার্বাঙ্ক অপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে তাঁর কার্যকুশলতায় জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন ; কিন্তু সামান্য মাত্রায় ভেষজ প্রয়োগে কি উপায়ে বৃক্ষদেহে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সংশোধিত হয়ে থাকে, তা বৈজ্ঞানিকদের নিকট এক জটিল রহস্যরূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

যাঁরা গাছপালা উৎপাদনে ব্যাপৃত আছেন তাঁরা জানেন, সাধারণ গাছপালা, লতাপাতা, ফুল-ফলের উৎকর্ষ সাধন করতে কত ধৈর্য, সতর্কতা ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়। হয়ত একটা জমিতে কতকগুলি ফুলের গাছ লাগান হয়েছে। গাছগুলি মোটের উপর কমবেশী সকলেই প্রায় একই রকম। কিছুদিন পরে হয়ত অতগুলি গাছের মধ্যে একটা গাছকে অসম্ভবরূপে বড় হতে দেখা গেল। তার ডাঁটা, পাতা, ফুল, ফল সকলই প্রায় দ্বিগুণ বড় হল। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাতেই প্রমাণিত হবে, তাদের আভ্যন্তরীণ কোষগুলিও দ্বিগুণিত হয়েছে। কাজেই আভ্যন্তরীণ জৈবসূত্রের বৈশিষ্ট্য উৎপাদক পদার্থগুলির শক্তিও বর্ধিত হবার কথা। উদ্ভিদ-বিদেরা আকস্মিক উদগত এইরূপ বৃক্ষ সংগ্রহ করে, তার বীজ থেকে পুনরায় বৃক্ষ উৎপাদন করে, বাছাই করতে করতে ক্রমশ উৎকৃষ্টতর নমুনা আহরণের ব্যবস্থা করেন। উদ্ভিদ তত্ত্ব সম্পর্কিত নিয়মানুযায়ী বার্বাঙ্ক-প্রদর্শিত উপায় অনুসরণই একার্যে সাফল্য লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু তা খুবই দক্ষতা ও সময়সাপেক্ষ। কাজেই প্রায় বছর চারেক পূর্বে যখন এ কথা প্রকাশিত হল যে, কলচিচিন নামে এক প্রকার বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগে বৃক্ষদেহে অদ্ভুত পরিবর্তন সংঘটিত হয় তখন উদ্ভিদ-উৎপাদকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। কার্ণেগী ইন্সটিটিউটের (ওয়াশিংটন) উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ডঃ ব্লেকস্লি কতকগুলি পরীক্ষার ফলে দেখতে পান—অতি সামান্য মাত্রায় কলচিচিন নামক ভেষজ প্রয়োগ করলে উদ্ভিদের মৌলিক জৈব উপাদানের প্রকৃতির অপূর্ব পরিবর্তন সংঘটিত হয়। উদ্ভিদ ও জীবকোষের অভ্যন্তরে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক সূত্রবৎ পদার্থ দেখতে

পাওয়া যায়। স্ত্রী-পুরুষ ভেদে এই সূত্র সংখ্যার নির্দিষ্ট তারতম্য লক্ষিত হয়। এই অদৃশ্য সূত্রবৎ পদার্থগুলি ক্রোমোসোম্‌স্ বা জৈবসূত্র নামে পরিচিত। ক্রোমোসোম্‌স্-এর অভ্যন্তরস্থ জিন্‌স্ এর মধ্যেই পিতামাতার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের বীজ অন্তর্নিহিত থাকে। এই ক্রোমোসোমস তথা জিনসের সাহায্যেই পিতামার বৈশিষ্ট্য সন্তানে প্রবর্তিত হয়ে থাকে। কল্‌চিচিন বাহ্যিকভাবে প্রযুক্ত হলেও এটি ধীরে ধীরে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ক্রোমোসোমস্‌গুলিকে এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দেয় যে তাদের আর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার উপায় থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষদেহের সঞ্চিত তেজ যেন আত্মপ্রকাশের নিমিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। তার ফলে উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফুল-ফলগুলিও বৃহদাকৃতি পরিগ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মোটের উপর, কল্‌চিচিন উদ্ভিদ-শরীরে এক প্রকার উত্তেজক পদার্থরূপে ক্রিয়া করে মাত্র। নচেৎ এতে বৃক্ষদেহের পরিপুষ্টির জন্য কোন সার বস্তুও নাই অথবা এটি বৃদ্ধির পরিপোষক কোন উপাদানও যোগায় না।

কল্‌চিচিন ঈষৎ হরিদ্রাভ এক প্রকার গুঁড়ার মত পদার্থ। বহুদিন পূর্ব থেকেই এটি ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অতি সতর্কতার সঙ্গে কল্‌চিচিন ব্যবহার করতে হয় কারণ এটি সাংঘাতিক বিষ। শরীরের কোন স্থানে অতি সামান্য লাগলেই তৎক্ষণাৎ ধুয়ে না ফেললে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং তার ফলে বিপজ্জনক অবস্থা সংঘটিত হওয়াও আশ্চর্য নয়। আঠালো পদার্থে মিশ্রিত অথবা জলমিশ্রিত কলচিচিন চারাগাছ, বীজ অথবা গাছের বাড়ন্ত স্থানে প্রয়োগ করলে দেখা যায়—যে গাছ লম্বায় সাধারণত এক হাতের বেশী উঁচু হত না, তা বেড়েছে প্রায় তিন হাত। যে ফুল সাধারণত এক ইঞ্চি চওড়া হত, সে ফুল চওড়ায় হয়ে যায় পাঁচ ইঞ্চিরও উপর। এক পাপড়িওয়ালা ফুল কলচিচিনের প্রভাবে অসংখ্য পাপড়ি সমন্বিত হয়ে বৃহদাকার ধারণ করে।

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে—একই জাতীয় গাছ বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে বর্ধিত হলে পরস্পরের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে। জীব ও উদ্ভিদ জগতে এরূপ পার্থক্য অহরহই ঘটছে। কিন্তু এই পার্থক্য অস্থায়ী। কারণ পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই নির্ভরশীল। বিশেষত পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হয় না। কিন্তু এদের মধ্যেই মাঝে মাঝে ক্বচিৎ এমন দু-একটা পরিবর্তন লক্ষিত হয় যে, তা সম্পূর্ণ স্থায়ীভাবেই আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিদের উপর সংক্রামিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ঘটতে পারে কিন্তু মূল বৈশিষ্ট্যটি অক্ষুণ্ণই রয়ে যায়। একে বলে 'মিউট্যাণ্ট'। এই 'মিউট্যাণ্ট থেকেই পৃথিবীতে নূতন নূতন গাছপালার আবির্ভাব ঘটে থাকে। কল্‌চিচিন প্রয়োগে উদ্ভিদদেহে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, প্রথমে তাকে অস্থায়ী পরিবর্তন বলে মনে হয়েছিল। কারণ যাকে ঔষধ প্রয়োগ করা হবে কেবল তারই পরিবর্তন স্বাভাবিক।

তাছাড়া দেখা যায় অর্জিত কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততিতে সঞ্চারিত হয় না। কিন্তু পরে দেখা গেল যে, এই নবলব্ধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমেই সঞ্চারিত হচ্ছে। কলচিচিন যে উদ্ভিদের মৌলিক জৈবসূত্রের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এ কথা কারও মনে হয় না। উদ্ভিদবিদেরা কলচিচিনের এই অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষ্য করে নূতন নূতন ফুল-ফল উৎপাদনে উঠেপড়ে লাগলেন। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য হল—কলচিচিন প্রয়োগে ফুল-ফলের নবলব্ধ বৈশিষ্ট্যকে বংশানুপরম্পরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা। কি উপায়ে তা করা যেতে পারে তার একটু আভাস দিচ্ছি। একটা ফুলের গাছে কোমল অবস্থায় ৪৪% মাত্রায় জল মিশ্রিত কলচিচিন প্রয়োগ করার ফলে যে ফুল উৎপাদন করবে তার আকার অসম্ভবরূপে বেড়ে যাবে। তার বর্ণ ও গন্ধের পরিবর্তন ঘটতেও পারে। কোমল তুলি বা পালকের সাহায্যে তার রেণু সংগ্রহ করে ঐ জাতীয় সাধারণ কতকগুলি ফুলের সঙ্গে তার পরাগ নিষেক করতে হবে। তাদের বীজ সংগ্রহ করে আলাদা আলাদাভাবে গাছ উৎপাদন করবার পর ফুল ফুটলেই বুঝা যাবে, পূর্বোক্ত কলচিচিন প্রভাবিত অতিকায় ফুলটির ক্রোমোসোম্‌সের সঙ্গে সাধারণ ফুলগুলির কোনটির ক্রোমোসোম্‌সের মিল হওয়ার ফলে অতিকায় বর্ণসংকর উৎপাদিত হয়েছে। কিন্তু সবগুলি ফুল অতিকায় নয়, হয়তো একগাছে দশটি ফুলে মধ্যে তিনটি অতিকায় আর বাকীগুলি সাধারণ ও মধ্যম। সর্বোৎকৃষ্ট ফুলগুলির বীজ রেখে অবশিষ্টগুলি নষ্ট করে ফেলতে হবে। বড় ফুলগুলির বীজ থেকে পুনরায় গাছ উৎপাদন করে উপরোক্ত নির্বাচন-প্রক্রিয়ায় স্থায়ী গুণ বিশিষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট ফুল উৎপাদন করা যেতে পারে।

উদ্ভিদবেত্তা ডেভিড্ বার্পি গাঁদাফুলের গাছে কলচিচিন প্রয়োগ করে অতিকায় গাঁদাফুলের উৎপাদন করেছেন। গাছগুলি বংশানুক্রমে নূতন ধরনের অতিকায় ফুল উৎপাদন করে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—শীঘ্রই আরও উৎকৃষ্টতর রকমারি ফুলের নমুনা প্রদর্শন করতে সমর্থ হবেন। কলচিচিন প্রয়োগে অতিকায় ফুল উৎপাদন করে তিনি প্রচলিত সাধারণ ফুলের সঙ্গে কৃত্রিম উপয়ে পরাগ নিষেক-প্রক্রিয়ায় তাদিগকে স্থায়ী বংশানুক্রমিক করবার ব্যবস্থা করেছেন। ফেরি-মোর্স নামক বিখ্যাত উদ্ভিদ উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কলচিচিন প্রয়োগে জিনিয়া, গাঁদা প্রভৃতি ফুল থেকে কয়েক জাতীয় অতিকায় ফুল উৎপাদন করে ব্যাপকভাবে তার চাষ করছেন। বোজার নামে বৃক্ষ উৎপাদক প্রতিষ্ঠানও কলচিচিনের সাহায্যে স্বাদে, গন্ধে লোভনীয়, নূতন ধরনের অনেকগুলি অতিকায় ফল ও ফুল উৎপাদন করেছেন। শীঘ্রই নাকি তাঁরা আরও অনেক অতিকায় গাছপালা, ফুলফল বাজারে বের করবেন। মোটের উপর, তাঁরা কেবল পরীক্ষামূলক ভাবে এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জন করেন নাই, প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ করছেন। ইউনাইটেড স্টেটসের কৃষিগবেষণাগারের বৈজ্ঞানিকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, কলচিচিন প্রয়োগে বর্ণসংকর উৎপাদন করে তামাক তূলা, রবিশস্য ও বিভিন্ন জাতীয় গাছপালা থেকে অল্পায়াসে প্রচুর পরিমাণ ফসল

উৎপন্ন করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন প্রদেশের পরীক্ষাগারে কলচিচিন প্রয়োগে উৎকৃষ্টতর ফলমূল উৎপাদনের নিমিত্ত অক্লান্ত চেষ্টা চলছে। নিউইয়র্কের কৃষি-গবেষণাগারে কলচিচিন প্রয়োগে অতিকায় ফলমূল উৎপাদনের চেষ্টা তো চলছেই অধিকন্তু ফল ও ফুলের রং. স্বাদ, গন্ধ পরিবর্তনের জন্যও বিবিধ পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে। কলচিচিন প্রয়োগবিধিও অতি সাধারণ। জলমিশ্রিত কলচিচিন হাত-পাম্পের সাহায্যে উদ্ভিদের বাড়ন্ত স্থানে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রয়োগের জন্য হোর্স পাইপেরও সাহায্য লওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গাছকে কলচিচিন মিশ্রিত জলে ডুবিয়ে পুনরায় রোপণ করলে অধিকতর সুফল লাভের সম্ভাবনা। মোটের উপর এই ঔষধ প্রয়োগে অতিকায় গাঁদা, জিনিয়া, কেলেণ্ডুলা, এস্টার, কসমস্, পিটুনিয়া, স্ন্যাপড্রাগন, ডালিয়া প্রভৃতি ফুলগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হচ্ছে। তাছাড়া কেবল পরীক্ষামূলক ভাবে কৃতকার্য হয়েছে এরূপ অনেক কিছুরই নাম করা যেতে পারে। ডালিয়া সাধারণত চার-পাঁচ ইঞ্চি চওড়া হয়ে থাকে—কলচিচিনের প্রভাবে আজকাল ১০ ইঞ্চি চওড়া ডালিয়া ফুটছে এবং এবং গাছগুলিও তদনুরূপ বৃহদাকৃতি ধারণ করেছে। উচু মই ছাড়া তা থেকে ফুল সংগ্রহ করা অসম্ভব। এক ইঞ্চি কি দেড় ইঞ্চি এস্টার এখন তিন থেকে ছয় ইঞ্চি চওড়া হয়েছে। বৃহদাকৃতির দরুন গছেগুলিকেও সহজে চিনবার উপায় নাই।

কলচিচিনের এই অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অবগত হবার পূর্বে কিছুকাল থেকেই বৃক্ষদেহে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগে অদ্ভুত ফল দেখা যাচ্ছিল। এই সকল রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ উদ্ভিদকে অতিদ্রুত বাড়িয়ে তোলে আবার কেউ কেউ তাদের বৃদ্ধি অতিমাত্রায় কমিয়ে দেয়। তবে এই জাতীয় রাসায়নিক পদার্থগুলির প্রধানত একটি ক্ষমতা দেখা যায় যে, এরা উদ্ভিদের কর্তিত স্থান থেকে দ্রুতগতিতে শিকড় উৎপাদন করে থাকে।

মনুষ্যশরীরে এণ্ডোক্রাইন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন নামে এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থের কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছে। বৃক্ষদেহেও বৃদ্ধি উত্তেজক এক প্রকার পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। একে উদ্ভিদ-হরমোন নামে অভিহিত করা হয়। প্রায় নয়-দশ বৎসর পূর্বে এটি উদ্ভিদদেহ থেকে নিষ্কাশন করে দানাদার পদার্থরূপে পরিণত করা হয়। এই সফলতা লাভের পর থেকেই উদ্ভিদ-হরমোনের অনুরূপ কোন পদার্থ কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যায় কিনা তার জন্যরাসাসায়নিকেরা উঠে পড়ে লাগলেন। তার ফলেই ইনডোল্ অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইনডোল্ ব্যুটিরিক অ্যাসিড, ন্যাপথালিন্ অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও অন্যান্য কতকগুলি পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বৃক্ষদেহে এদের প্রক্রিয়া স্বাভাবিক হরমোনের অনুরূপ। এই কৃত্রিম হরমোনসমূহের একটা প্রধান কার্যকারিতা এই যে, এর প্রয়োগে উদ্ভিদের কর্তিত স্থান থেকে প্রচুর পরিমাণে শিকড় উদগম হয়ে থাকে। কাজেই অন্যত্র রোপণ

করলে আধিক্যবশত কর্তিত অংশ অতি সত্বর পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠে। এই রাসায়নিক পদার্থগুলিকেও অতি অল্প মাত্রায় প্রচুর জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা আঠালো পদার্থ সহযোগে বৃক্ষের কর্তিত স্থানে প্রয়োগ করা হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, এক আউন্স রাসায়নিক হরমোন ১০,০০০,০০০,০০০ নূতন শিকড় উৎপাদনে সক্ষম। যখনই দেখা গেল কৃত্রিম হরমোন অসম্ভব দ্রুতগতিতে শিকড় উৎপাদনে সক্ষম তখন থেকেই উদ্ভিদ উৎপাদকেরা প্রচুর পরিমাণে এর ব্যবহার সুরু করেছেন। এখন তো প্রায় সর্বত্রই উদ্ভিদ-হরমোন ব্যবহার একটা রেওয়াজ হয়ে গেছে। ফলের ভারে যাতে ডাল ভেঙ্গে না পড়ে এজন্য এক জাতীয় হরমোন প্রয়োগে গাছকে শক্ত করে তোলা হচ্ছে। কোন কোন কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগে গাছের অজস্র ডালপালা গজাচ্ছে। কোন কোন স্থানে অতিরিক্ত তুষারপাতে গাছের ফল অকালে ঝরে পড়ে। এই অসুবিধা দূর করবার জন্য হরমোন প্রয়োগে এমন এক জাতীয় গাছ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে যা অনেক বিলম্বে ফলবতী হয়ে থাকে। কাজেই তুষারপাতে ফল নষ্ট হবার আশংকা থাকে না। কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগে পরীক্ষামূলক ভাবে বীজশূন্য লংকামরিচ, শশা, বেগুন, তরমুজ আরও অন্যান্য অনেক ফল উৎপাদন করা হয়েছে। পরাগ নিষিক্ত না হলে কোন ফলই পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করতে পারে না। পরাগ বা ফুল-রেণুর পরিবর্তে রাসায়নিক হরমোন প্রয়োগ করে উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞেরা বীজশূন্য ফল উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন। আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে বৈজ্ঞানিকেরা এই কৃত্রিম হরমোনের পরীক্ষা আরম্ভ করেছেন। আমগাছে সাধারণ গুলকলম তৈরি করা যায় না। বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ও আশুতোষ গুহ ঠাকুরতা কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগে আমগাছেও গুলকলম উৎপাদন করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁরা হরমোন প্রয়োগে বীজশূন্য ফলোৎপাদনের চেষ্টাও করেছেন। উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুততর করবার জন্য সম্প্রতি ভিটামিন বি-১-এর আশ্চর্য ক্ষমতার কথা জানা গেছে। অদূর ভবিষ্যতে এই সম্বন্ধে আরও অদ্ভুত কথা শুনবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

(প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৪৭)

অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদ ও তাদের জীবনস্পন্দন
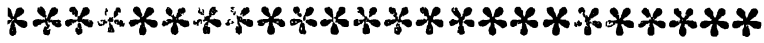
উদ্ভিদ ও প্রাণীর মধ্যে একই জীবনীশক্তি ক্রিয়া করলেও তারা উভয়ে ক্রমবিকাশের পথে বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করে পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হয়েছে। প্রাণীদেহের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তারা বাইরের উত্তেজনায় শরীর সঙ্কুচিত করে বা অবস্থাবিশেষে চিৎকার বা অঙ্গভঙ্গি করে সাড়া দিয়ে থাকে। অ্যামিবা নামক আণু-বীক্ষণিক প্রাণী শরীর প্রসারিত করে চলে; কিন্তু হঠাৎ একটু নাড়া পেলেই সঙ্কুচিত হয়ে বর্তুলাকার ধারণ করে। উত্তাপ, শৈত্য, বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা কোন-রূপ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ মাত্রই এরা একই ভাবে শরীর সঙ্কুচিত করে সাড়া দেয়। প্রয়োজনের তাগিদে অথবা উত্তেজনা প্রয়োগে অঙ্গসঞ্চালনের ক্ষমতা দেখেই সাধারণত আমরা প্রাণী ও উদ্ভিদের পার্থক্য বুঝে থাকি। কিন্তু আমাদের দেশীয় লজ্জাবতী-জাতীয় উদ্ভিদদেহের অঙ্গসঞ্চালন-ক্ষমতা সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন অবস্থায় এদের অঙ্গসঞ্চালনের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। বাইরের আঘাত-উত্তেজনায় এরা এমন দ্রুত গতিতে অঙ্গসঞ্চালন করে সাড়া দিয়ে থাকে যে অনেক উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যেও এরূপ ক্ষিপ্রতা পরিদৃষ্ট হয় না। এক আকৃতি-গত পার্থক্য ছাড়া এদের সঙ্গে আর কোন পার্থক্যই সহজে উপলব্ধি হয় না। আমাদের দেশে বনে-জঙ্গলে লজ্জাবতী নামে এক বোঁটায় চারটি পাতাওয়ালা এক প্রকার ছোট ছোট গাছ প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায়। গাছের গায়ে গোলাপ গাছের মত কাঁটা। পাতাগুলি দেখতে ছোট ছোট তেঁতুল-পাতার মত। শুঁয়ার মত পাপড়িযুক্ত বেগুনে রঙের গোল গোল ফুল ফোটে। একটু স্পর্শ করলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্রগুলি অতি দ্রুত গতিতে পর পর মুদ্রিত হয়ে যায়। স্পর্শজনিত আঘাত একটু বেশি হলেই ক্ষুদ্র পত্রগুলি মুড়বার সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা লম্বা বোঁটাগুলি ঝুপ ঝুপ করে নীচের দিকে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকবার পর ধীরে ধীরে আবার পাতা মেলে আগের অবস্থা ফিরে পায়। সন্ধ্যাসমাগমে পাতা মুদ্রিত হলেও আঘাতের ফলে পড়ে যাওয়ার অবস্থা থেকে তার পার্থক্য পরিষ্কার উপলব্ধি হয়। একটু জোরে বাতাস বইলে, ফুঁ দিলে, বা জলের ফোঁটা পড়লেও তৎক্ষণাৎ পাতা মুদ্রিত হয়ে যায়, বাতাসে পাতা নড়ে পরস্পর ঠোকাঠুকি হলেও পাতা মুদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু অনেকক্ষণ বাতাস বইতে থাকলে বা বার বার আঘাত পাওয়ার পর এরা এমন অসাড় হয়ে পড়ে যে, অল্পসময় ব্যবধানে পুনরায় বাতাস বইলে বা জোরে আঘাত দিলেও আর সহজে মুদ্রিত হতে চায় না। কিন্তু অনেকক্ষণ নিশ্চেষ্ট থাকবার পর সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা পুনঃপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কোন স্থলে

সামান্য একটি পোকায় দংশন করলেও দেখতে দেখতে পাতাগুলি একদিক থেকে মুদ্রিত হয়ে বোঁটাগুলি ক্রমে ক্রমে ঝুপ ঝুপ করে পড়ে যেতে থাকে। সময়ে সময়ে দেখা যায় কোথাও কিছু নাই হঠাৎ একটি পাতা মুড়ে গিয়ে বোঁটাসমেত কাৎ হয়ে পড়ে গেল। আভ্যন্তরিক কোন অস্বস্তির কারণেই বোধ হয় ওরূপ ঘটে থাকে। শত শত গাছ একসঙ্গে জন্মে জঙ্গল হয়ে রয়েছে। কাঁটার ভয়ে তার মধ্যে পা বাড়াবার জো নেই। হঠাৎ তার মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়লে দেখা যাবে চক্ষের নিমেষে যেন রঙ্গমঞ্চের পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। একটু আগেই যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য পত্রাবৃত ঝোপ ছিল, এখন আর সে-সব কিছুই নেই, সব ফাঁকা. কেবল কতকগুলি নেড়া কাঠি যেন এদিক-ওদিক ইতস্তত পড়ে রয়েছে। ভোজবাজীর মত স্থানটার চেহারা এমনই বেমালুম বদলে যায়। আত্মরক্ষার জন্য কাঁটা থাকলেও অনেকেও অনুমান করেন এটি তাদের শত্রুর কবল থেকে আত্মরক্ষার একটা কৌশল মাত্র। একথা সত্য হলে এরা আত্মরক্ষার্থ অনুকরণকারী প্রাণীদের অপেক্ষা এ-বিষয়ে অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছে এতে কোনই সন্দেহ নেই। অনেক জাতের প্রজাপতি ও অনুকরণকারী কীটপতঙ্গ ভয় পেলেই পাতার সঙ্গে দেহ মিলিয়ে আত্মগোপন করে থাকে। মুদ্রিত অবস্থায় এদের দেখলে সেরূপ কিছু একটা মনে হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়।

এ-পর্যন্ত বহু জাতের লজ্জাবতী গাছের সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের দেশে ছোট ছোট জল ও স্থল লজ্জাবতী সর্বজনপরিচিত। কিন্তু তাছাড়া বিভিন্ন জাতীয় বড় বড় লজ্জাবতীর গাছও বিরল নয়।

জল-লজ্জাবতী হিঞে বা কলমি দলের মত জলের উপর লতিয়ে চলে। বর্ষাসমাগমেই এদের প্রাচুর্য দেখতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক গাঁটের মধ্যে সাদা স্পঞ্জ বা জড়ানো তুলার মত এক প্রকার হাল্কা পদার্থ জন্মায়। এগুলিই এদের জলের উপর শোলার ন্যায় ভাসিয়ে রাখে। প্রত্যেক গাঁট থেকে একটি করে বোঁটা বের হয়। তার প্রান্তদেশে আলাদাভাবে দু-জোড় করে পাতা থাকে। এদের পাতা-গুলিও দেখতে স্থল-লজ্জাবতীর মত ; কিন্তু সামান্য একটু চওড়া. একটু নাড়াচাড়া পেলেই এদের পাতা মুদ্রিত হয়ে যায়। কিন্তু এদের গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। এদের ফুলের রঙ হলদে এবং বোঁটার মাথায় গুচ্ছাকারে ফুটে থাকে। জল-লজ্জাবতীর গায়ে কাঁটা নেই। শীতকালে এদের যত্ন করে জিইয়ে রাখলে দেখা যায় ডাঁটার গায়ে পূর্বোক্ত শোলা-জাতীয় ভাসমান পদার্থ জন্মায় না, কিন্তু বর্ষার সঙ্গে সঙ্গেই এই শোলা-জাতীয় পদার্থ গজাতে থাকে। ডাঙায় জন্মাতে দিলেও এরা বেশ লতিয়ে থাকে। কিন্তু শোলা জন্মায় না।

আমাদের দেশে বড় বড় লজ্জাবতীও দু-তিন রকমের দেখতে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে গাছ-লজ্জাবতীই সর্বাপেক্ষা বড় হয়ে থাকে, এরা লম্বায় পাঁচ-সাত হাত পর্যন্ত উঁচু হয়। এই গাছের গায়েও কাঁটা আছে। পাতার ডাঁটাগুলি খুব বড় হয়ে থাকে এবং এক-একটি বোঁটায় সাত জোড়া করে পাতা থাকে। প্রত্যেক

জোড়া পাতার সন্ধিস্থল থেকে উপরের দিকে লম্বা লম্বা এক-একটা কাঁটা বের হয়। জোরে হাওয়া দিলে বা ছুঁয়ে দিলে পাতাগুলি মুদ্রিত হয়ে যায়। তবে মুদ্রিত হবার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর। অন্য আর এক প্রকার গাছ-লজ্জাবতী দেখতে পাওয়া যায়—এরা দেড় হাত দু-হাত উঁচু হয় এবং ঝোপ হয়ে জন্মে। এদের বোঁটায় একজোড়া করে পাতা থাকে। ছুঁয়ে দিলে এদের পাতাগুলিও মুদ্রিত হয়ে পড়ে।

আর এক প্রকার ছোট ছোট গাছও আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায়। এদের ভুঁই-আমলা বলে। আঘাত উত্তেজনায় এদের পাতাগুলিও মুদ্রিত হয় বটে, কিন্তু অতি ধীরে ধীরে।

কামরাঙা আমাদের দেশের সুপরিচিত উদ্ভিদ। এই কামরাঙার পাতারও বেশ স্পর্শানুভূতি দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, খুব মৃদু স্পর্শে এরা সহজে সাড়া দেয় না। আর দিলেও তা পরিষ্কারভাবে আমাদের নজরে পড়ে না। কিন্তু পাতার উপর একটু জোরে আঘাত করলেই দেখা যায় পাতাগুলি জোড়ায় জোড়ায় বুজে আসছে।

এই তো গেল আঘাত উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ সাড়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত। কিন্তু জীবদেহে হৃৎস্পন্দন বলে যে একটি আশ্চর্য ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, কোন কোন উদ্ভিদে ঠিক একই রকম ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। মানুষ এবং অন্যান্য জীবের হৃৎপিণ্ড নামক পেশীটি যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ আপনাআপনি ঠিক যেন তালে তালে স্পন্দিত হতে থাকে। বন-চাঁড়াল নামে এক জাতীয় উদ্ভিদের এরূপ স্বতঃস্পন্দন অতি পরিষ্কাররূপে দৃষ্টিগোচর হয়। এই গাছ প্রায়ই ঝোপের মত হয় এবং প্রায় দু-হাত আড়াই হাত উঁচু হয়ে থাকে। এক একটি বোঁটায় তিনটি করে পাতা থাকে। বোঁটার,প্রান্তদেশের পাতাটি খুবই বড় এবং সম্মুখ-ভাগের পাতা দুটি অতি ক্ষুদ্র এবং এরাই তালে তালে নৃত্য করে থাকে। লোকের বিশ্বাস তুড়ি দিলেই বন-চাঁড়ালের পাতার নাচ সুরু হয় কিন্তু তা ঠিক নয়। রৌদ্রের সময় এরা আপনা আপনিই ওঠা-নামা করতে থাকে।

লজ্জাবতী বা বন-চাঁড়াল-জাতীয় উদ্ভিদের স্বভাব সাধারণ উদ্ভিদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। কিন্তু তথাপি একটু লক্ষ্য করলেই সাধারণ অনেক উদ্ভিদের মধ্যেও এরূপ পত্রসঞ্চালনের ক্ষমতা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে বা বর্ষা-বাদলের দিনে অনেক উদ্ভিদের পাতাই আপনাআপনি মুড়ে যায়; আবার আলো দেখলেই ঘুমের ঘোর কেটে যায় এবং পাতা প্রসারিত করতে থাকে। পাতার এরূপ সঙ্কোচন ও প্রসারণ যতই মন্দ-গতিতে হোক না কেন, এতে তাদের অঙ্গ-সঞ্চালন-ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রাণীজগৎ ছাড়াও আমাদের চতুর্দিকে বিস্তৃত এক বিরাট উদ্ভিদ-জগৎ ব্যাপী জীবনের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কিন্তু প্রাণীজগতের বাহ্য লক্ষণগুলি সাধারণত তাতে পরিস্ফুট না হলেও এই অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদ-

গুলির অদ্ভুত ব্যবহার প্রাণীজগতের সঙ্গে যথেষ্ট সৌসাদৃশ্যের পরিচয় দেয়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে উদ্ভিদ-দেহের জীবন-ক্রিয়ার বিষয় অনুসন্ধান করলে দেখা যায় এই অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদ ছাড়াও অন্যান্য সকল প্রকার উদ্ভিদের প্রাণীর জীবন-ক্রিয়ার সঙ্গে কোনই পার্থক্য নেই। আচার্য জগদীশচন্দ্র তার জীবনব্যাপী সাধনায় এ বিষয়ের অতি নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করে দেখিয়ে গেছেন। উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনের ঐক্য বুঝতে হলে বৃক্ষের আভ্যন্তরিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা প্রয়োজন. কিন্তু আভ্যন্তরিক পরিবর্তন কি উপায়ে জানা যাবে? বৃক্ষ উত্তেজিত বা অবসাদগ্রস্ত হলে তার ভিতরের অদৃশ্য পরিবর্তন কেমন করে বুঝতে পারা যাবে? আঘাত উত্তেজনায় গাছ সাড়া দিলে তা কোন স্থানে ধরতে ও মাপতে পারলে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। জীব বাইরের শক্তি দ্বারা আহত হলে অবস্থা-বিশেষে চিৎকার করে নতুবা হাত-পা নেড়ে প্রতিক্রিয়ার অবস্থা প্রকাশ করে। বাইরের আঘাত বা নাড়াচাড়ার পরিমাণ অনুসারে সাড়ার আকৃতি-প্রকৃতি মিলিয়ে দেখলেই জীবন-ক্রিয়ার অবস্থা জানতে পারা যায়। উত্তেজিত অবস্থায় অল্প নাড়ায় প্রচণ্ড সাড়া পাওয়া যায়, আবার অবসন্ন অবস্থায় অধিক নাড়ায়ও ক্ষীণ সাড়া দিয়ে থাকে। মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে, হঠাৎ সর্বপ্রকার সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায়।

জীব আঘাত পেলে সঙ্কুচিত হয়, সেই সঙ্কোচনই জীবনের সাড়া। বৃক্ষও আহত হলে ক্ষণিকের জন্য সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু সেই সঙ্কোচন অতি ক্ষীণ বলে আমরা সচরাচর দেখতে পাই না। কলের সাহায্যে সেই সঙ্কেচন বৃহদাকারে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। আঘাতে যদি গাছ সাড়া দেয়, তবে সেই আঘাত অনুভব করতে তার কত সময় লাগে? বাইরের আঘাত ভিতরে কি করে পৌঁছে? আহার দিলে অথবা আহার বন্ধ করলে কোন পরিবর্তন হয় কিনা? ঔষধ সেবন বা বিষপ্রয়োগে কি অবস্থা হয়? জীবের হৃৎপিণ্ডের উদ্ভিদের মত কোন স্পন্দনশীল পেশী আছে কিনা? আচার্য জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার ফলে নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, গাছ মাত্রেই বাইরের আঘাত-উত্তেজনায় সাড়া দিয়ে থাকে এবং এ বিষয়ে জীবে উদ্ভিদে কোনই পার্থক্য নেই। তবে লজ্জাবতী গাছ পাতা নেড়ে সাড়া দেয়, আর সাধারণ গাছ দেয় না কেন? আমাদের হাতের এক পাশের মাংসপেশীর সঙ্কোচনের ফলেই হাত নেড়ে সাড়া দিতে পারি, উভয় দিকের পেশী একই সময়ে সঙ্কুচিত করলে হাত নেড়ে সাড়া দেওয়া চলত না। সাধারণ উদ্ভিদের পত্র-পল্লবের চতুর্দিকের পেশী আহত হয়ে সমভাবে সঙ্কুচিত হয়, কাজেই কোন দিকেই নড়াচড়া করতে পারে না। যদি ক্লোরোফরম প্রয়োগে একদিকের পেশী অসাড় করে দেওয়া যায়, তবেই দেখতে পাওয়া যাবে আহত হলে যে-কোন গাছ পাতা নেড়ে সাড়া দেবে। ব্যাঙের গায়ে চিমটি কাটলে সেই মুহূর্তে সাড়া পাওয়া যাবে না—সাড়া পেতে প্রায় এক সেকেণ্ডের শত ভাগের এক ভাগ সময় লেগে থাকে। বাইরের অবস্থানুসারে এই অনুভূতি-কালের হ্রাস ঘটে। অপেক্ষাকৃত

প্রবল আঘাত অনুভব করতে অতি কম সময়ই লেগে থাকে, কিন্তু মৃদু আঘাতের অনুভূতিতে একটু সময় ব্যয় হয়। সতেজ অবস্থায় লজ্জাবতীর অনুভবশক্তি ব্যাঙের তুলনায় ছয় গুণ বেশি, কিন্তু যখন শীতে বা অন্য কোন কারণে আড়ষ্ট হয়ে পড়ে তখন এই অনুভূতিকাল অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে যায়। অধিক ক্লান্ত হলে অনুভব-শক্তির সাময়িক বিলোপ ঘটে, তখন গাছ মোটেই সাড়া দেয় না। এই সম্বন্ধে লজ্জাবতী গাছের আচরণ পূর্বেই বর্ণনা করেছি। গরম জলে স্নান করিয়ে নিলে তার এই জড়তা তাড়াতাড়ি দূর হয়। জন্তুদেহের একস্থানে আঘাত করলে তার ধাক্কা স্নায়ুর সাহায্যে দূরে প্রবাহিত হয়। উষ্ণতায় স্নায়ুপ্রবাহের বেগ বৃদ্ধি পায় আবার ঠাণ্ডায় বেগ হ্রাস পায়। বৃক্ষদেহে স্নায়ুপ্রবাহ প্রাণীদের অপেক্ষা মন্থর গতিতে পরিচালিত হয়ে থাকে, কিন্তু স্নায়ু সম্বন্ধে যত প্রকার পরীক্ষা আছে, তার সমস্ত পরীক্ষা দ্বারা. জীব ও উদ্ভিদে যে এ-সম্বন্ধে কোন ভেদ নেই তা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে।

জীবদেহের অংশবিশেষে একটি আশ্চর্য পেশী আছে। যতকাল জীবন থাকে তা ততকাল অহরহ স্পন্দিত হতে থাকে। কিন্তু কি করে এই স্বতঃস্পন্দন ঘটে থাকে, তা আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। পূর্বেই বলেছি, বন-চাঁড়ালের পত্রেও এরূপ স্বতঃস্পন্দন দেখতে পাওয়া যায়। বৃক্ষদেহের এই স্বতঃস্পন্দনের কারণ অনুসন্ধানের ফলে হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে এই রহস্য-স্পন্দন উদ্ঘাটিত হবে। শারীরতত্ত্ববিদেরা হৃৎপিণ্ডের এক অদ্ভুত রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর হৃৎপিণ্ড কেটে নিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু শরীর থেকে হৃৎপিণ্ড বের করে নিলেই তার স্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তখন সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে রক্তের চাপ প্রয়োগ করলে অনেকক্ষণ করে স্পন্দন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। তারপর নানাভাবে এর উপর পরীক্ষা চলতে পারে। উত্তাপ-প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়, কিন্তু শৈত্যের ফল তার বিপরীত। নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগে স্পন্দনের তাল নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। ইথার প্রয়োগে সাময়িকভাবে স্পন্দন স্থগিত হয়, কিন্তু একটু হাওয়া করলেই স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। ক্লোরোফরম-প্রয়োগে হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে পড়ে। মাত্রা বেশি হলে হৃৎস্পন্দন চিরতরে বিলুপ্ত হবার আশঙ্কা আছে। বন-চাঁড়ালের স্পন্দনশীল পত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার ফলে এটি সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, আঘাত-উত্তেজনায় কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আণবিক সংস্থান বিপর্যস্ত হলেই জীব ও উদ্ভিদে একই নিয়মে সাড়ার অভিব্যক্তি ঘটে থাকে। তবে কোন উপায়ে এই আণবিক সন্নিবেশ নিয়ন্ত্রিত করা যেতে পারে কি। এই সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, "তবে কি উপায়ে আণবিক সন্নিবেশ 'সমুখ' অথবা 'বিমুখ' হইতে পারে? এরূপ দেখা যায় যে বিদ্যুৎপ্রবাহ একদিকে প্রেরণ করিলে নিকটের চুম্বকশলাকাগুলি ঘুরিয়া একমুখী হইয়া যায়। বিদ্যুৎপ্রবাহ অন্যদিকে প্রেরণ করিলে শলাকাগুলি ঘুরিয়া অন্যমুখী

হয়। বিদ্যুৎবাহক জলীয় পদার্থের ভিতর দিয়া যদি বিদ্যুৎ স্রোত প্রেরণ করা যায় তবে অণুগুলিও বিচলিত হয়ে যায় এবং অণুসন্নিবেশ বিদ্যুৎস্রোতের দিক্ অনুসারে নিয়মিত হইয়াই থাকে।

"স্নায়ুসূত্রে এই উপায়ে দুই বিভিন্ন প্রকার আণবিক সন্নিবেশ করা যাইতে পারে। প্রথম পরীক্ষা লজ্জাবতী লইয়া করিয়াছিলাম। আঘাতের মাত্রা এরূপ ক্ষীণ করিলাম যে লজ্জাবতী তাহা অনুভব করতে সমর্থ হইল না। তাহার পর আণবিক সন্নিবেশ সমুখ করা হইল। অমনি যে আঘাত লজ্জাবতী কোন দিনও টের পায় নাই, এখন তাহা অনুভব করিল এবং সজোরে পাতা নাড়িয়া সাড়া দিল। ইহার পর আণবিক সন্নিবেশে 'বিমুখ' করিলাম, এবার লজ্জাবতীর উপর প্রচণ্ড আঘাত করিলেও, লজ্জাবতী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না, পাতাগুলি নিস্পন্দিত থাকিয়া উপেক্ষা জানাইল।

"তাহার পর ভেক ধরিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে পরীক্ষা করিলাম। যে আঘাত ভেক কোন দিনও অনুভব করে নাই স্নায়ুসূত্রে 'সমুখ' আণবিক সন্নিবেশে সে তাহা অনুভব করিল এবং গা নাড়িয়া সাড়া দিল। তাহার পর 'কাটা ঘায়ে নুন' প্রয়োগ করিলাম এবার ব্যাঙ ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু যেমনই আণবিক সন্নিবেশ 'বিমুখ' করিলাম অমনই বেদনাজনক প্রবাহ যেন পথের মাঝখানে আবদ্ধ হইয়া রহিল এবং ব্যাঙ একেবারে শান্ত হইল।"

(প্রবাসী, ফাল্গুন, ১৩৪৪)

লাফানো মটর

****

কোন কোন উদ্ভিদ পোকামাকড় ধরে খায় একথা সকলেই শুনেছে। অনেকে হয়তো উদ্ভিদের শিকারকৌশল প্রত্যক্ষও করেছে। কিন্তু গাছের বীজ মাটিতে পড়ে জীবন্ত প্রাণীর মত লাফিয়া চলে—এই দৃশ্য কখনও কেউ প্রত্যক্ষ করেছে কি? না দেখে থাকলে কেউই হয়তো বিশ্বাস করতে চাইবে না যে, এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড কখনও সম্ভব হতে পারে। আমার একবার লম্ফপ্রদান-কারী বীজ স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ ঘটেছিল। বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ্ ডঃ সত্যচরণ লাহা একবার এইরূপ কতকগুলি বীজ সংগ্রহ করেছিলেন। আমাকেও তিনি সেগুলি দেখিয়েছিলেন। টেবিলের উপর রাখবার কিছুক্ষণ পরেই দু-একটা বীজ লাফিয়ে ছিটকে পড়ল। দু-একটাকে ঈষৎ নড়াচড়া করতেও দেখলাম। কিন্তু ঈষদুষ্ণ একটা পাত্রে রাখবার পর প্রায় সবগুলি বীজই খই ফোটার মত একসঙ্গে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিল। বীজগুলি ছিল সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত। কেমন করে তারা এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার করছে তা বুঝতে না পেরে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সেগুলি দেখান হয়। তিনি এর রহস্য উদ্ভেদ করে দেন।

আমেরিকার মেক্সিকো রাজ্যে সেবাস্টিয়ানা গণভুক্ত এক প্রকার জংলী গাছ দেখতে পাওয়া যায়। পেকে মাটিতে পড়বার পর এদেরই বীজগুলি লম্ফ প্রদানে যখন তখন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সঞ্চরণ করে থাকে। বীজগুলি দেখতে সাধারণ মটরের মত কিন্তু সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। প্রকৃতপক্ষে মটর না হলেও আমরা এগুলিকে মটর নামেই অভিহিত করছি। বীজের গঠনপ্রণালী আমাদের দেশের আমলকী ফলের বীজের মত। আমলকীর বীজ ভাঙলে যেমন বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে, এই লাফানো বীজগুলি সেরূপ বাইরের দিকে মসৃণ হলেও ভাঙলে তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। রোদ লাগলে অথবা কোন কারণে উত্তাপ বৃদ্ধি পেলেই বীজগুলি লাফাতে শুরু করে এবং লাফাতে লাফাতে কোন ঠাণ্ডা জায়গায় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত শান্তভাবে ধারণ করে না। গাছের প্রত্যেকটি বীজই যে এরূপভাবে লম্ফ প্রদান করতে সক্ষম, তা নয়, তবে অধিকাংশ বীজই এই অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে।

এক সময়ে বৈজ্ঞানিক ও অবৈজ্ঞানিক অনেকেই এই বীজের লম্ফ প্রদানের অদ্ভুত ক্ষমতার কারণ নির্ণয়ে যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কেউ কেউ এই অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, বীজের শক্ত খোলার অভ্যন্তরস্থ অতি সামান্য পরিমাণ আবদ্ধ বায়ু রৌদ্রের তাপে আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে বীজটাকে

ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে। কিন্তু আবার কেউ কেউ বলেছিলেন যে, বায়ুর চাপে বীজটা লাফিয়ে উঠতে পারে না ; খোলার অভ্যন্তরস্থ পদার্থসমূহের অসমানভাবে উত্তপ্ত হবার ফলে সংকোচন ও প্রসারণের তারতম্যেই এরূপ ঘটে থাকে। কিন্তু কয়েকটি পরীক্ষায় তাদের কোন মতবাদেরই সত্যতা প্রমাণিত হয় নি। অবশেষে সঞ্চরণক্ষম বীজ কেটে তার অভ্যন্তরভাগ পরীক্ষার ফলেই এই অপূর্ব রহস্য উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছিল। পূর্বেই বলেছি, অধিকাংশ বীজের লাফাবার ক্ষমতা থাকলেও প্রত্যেকটি বীজই সঞ্চরণক্ষম নয়। কিন্তু একথা পূর্বে কেউ জানত না, কাজেই তখন প্রত্যেকটি বীজকেই সক্রিয় মনে করে দৈবাৎ দু-একটি নিষ্ক্রিয় বীজ কেটে পরীক্ষা করবার ফলেই সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠেছিল। কারণ নিষ্ক্রিয় বীজকে সক্রিয় মনে করে তার অভ্যন্তরভাগ অনুসন্ধানের ফলে শাঁস ছাড়া আর কিছুরই সন্ধান মেলে নি। যাহোক, এর পরে একটি লাফানো বীজ ভেঙে দেখা গেল - বীজটির ভিতরে ছোট একটি পোকা রয়েছে, এই পোকাগুলি "কারপো-ক্যাপসা সল্‌টিটানস" নামক এক প্রকার মথ-প্রজাপতির বাচ্চা। মটরগুলি যখন খুব কাঁচ অবস্থায় থাকে তখন এই মথ-প্রজাপতির এক একটি ফলের গায়ে এক একটি ডিম পেড়ে যায়। ডিম ফুটে বাচ্চাটি কচি ফলের গায়ে সূক্ষ্ম ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং ফলের আবরণ অক্ষত রেখে ভিতরের অংশ কুরে খায়। ফলটি বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছিদ্রও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। উপরের আবরণের কোন অনিষ্ট না হওয়ায় ফলটি স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং শরীরের বৃদ্ধি অনুপাতে বাচ্চাটিও অভ্যন্তরভাগে প্রয়োজনীয় স্থান করে নেয়। ফল পাকবার প্রায় সমকালেই বাচ্চারও খাওয়া শেষ হয়। এখানে একটু বলে রাখা প্রয়োজন যে, প্রজাপতি ও মথের বাচ্চারা সকলেই কোন না কোন প্রকারের শুঁয়াপোকার আকৃতি ধারণ করে। অবশ্য শুঁয়াপোকা বললেই যে, সকল জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চারই শুঁয়া থাকবে— এমন কথা নয়। অনেক প্রজাপতির বাচ্চার শরীরে শুঁয়া থাকে না। সেগুলিকেও আমরা সাধারণত শুঁয়াপোকা বলে থাকি। প্রজাপতি ও মথের বাচ্চাগুলিকে ইংরেজিতে বলা হয় ক্যাটারপিলার। মটরের ভিতরের বাচ্চাগুলিও এক জাতীয় শুঁয়াপোকা বা ক্যাটারপিলার। কিন্তু এদের গায়ে শুঁয়া নেই। প্রজাপতি বা মথের বাচ্চাগুলি ডিম থেকে বের হয়েই পরিণত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত রাতদিনই প্রায় আহারে ব্যস্ত থাকে। তারপর খাওয়া বন্ধ করে পুত্তলিতে রূপান্তরিত হয়। পুত্তলি অবস্থায় সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে এবং কিছুদিন পর হঠাৎ এক সময় পূর্ণাঙ্গ মথ বা প্রজাপতি রূপ ধারণ করে পুত্তলি থেকে বের হয়ে আসে।

মটরটি যখন গাছ থেকে মাটিতে পড়ে যায় সেই সময় অভ্যন্তরস্থ পোকাটির শুঁয়াপোকার আকৃতি পরিত্যাগ করে পুত্তলির আকৃতি পরিগ্রহ করবার কথা। কিন্তু অন্যান্য শুঁয়াপোকা থেকে এখানেই এদের একটা বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। খাওয়া শেষ হলেও এরা অনেক পরে পুত্তলির আকার ধারণ করে। কোন কোন

প্রজাপতির বাচ্চার পুত্তলিতে রূপান্তরিত হবার পূর্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে মাত্র দু-এক ঘণ্টা, কারও ১০।১৫ ঘণ্টা কারও আবার ৫।৭ দিন এরূপ বিভিন্ন সময় লাগতে দেখা যায়। উল্লিখিত মটরের পোকাদের কিন্তু সুপ্তাবস্থা কাটাবার জন্য সূতা বুনে কুঠরি নির্মাণ করতে অনেকদিন অতিবাহিত হয়। তাছাড়া যে সময় মটরগুলি পেকে মাটিতে পড়ে, ঐ সকল অঞ্চলে সে সময় সূর্যের তেজ খুবই প্রখর থাকে। মটরের অভ্যন্তরস্থ শুঁয়াপোকা এই উত্তাপ সহ্য করতে পারে না। কাজেই রোদ লাগলেই সে স্থান থেকে সরে যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে অথচ পুত্তলির আকার ধারণ করলে আর নড়াচড়ার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং পরিণত অবস্থায় উপনীত হলেও স্বভাবজাত সংস্কারবশেই যেন তারা পুত্তলিতে রূপান্তরিত হতে কয়েক মাস বিলম্ব করে এবং ফলটা লাফিয়ে বা গড়িয়ে রোদ থেকে ছায়াযুক্তস্থানে গিয়ে অবস্থান করতে পারে সেজন্য অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

বাইরের সঙ্গে কোন যোগাযোগ না থাকা সত্ত্বেও আবদ্ধ পোকাটা বীজটাকে লাফিয়ে বেড়াবার ব্যবস্থা করে কেমন করে? মনে করা যাক, ডিমের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। লাফাতে গেলে ব্যাঙের পিছনের ঠ্যাং দুটি যতদূর প্রসারিত হওয়া সম্ভব, ডিমের অভ্যন্তরে ততটুকু মাত্র স্থান আছে। ব্যাঙটা এখন ভিতরে লাফাতে আরম্ভ করলে ডিমের খোলাটাও কি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠবে? ডিমটা নড়াচড়া করতে পারে, কিম্বা পাশের দিকে ধাক্কা লাগলে গড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু লাফিয়ে উঠতে পারে না। কারণ একই নীচের দিকে পায়ের চাপ ও উপরের দিকে ধাক্কায় ডিমটি সাম্যাবস্থায় অবস্থান করবে। উভয় দিকের চাপের বৈষম্য না ঘটলে ডিমের ঊর্ধ্বগতি সম্ভব নয়। মটরের বেলায়ও ঠিক একই ঘটে। আবদ্ধ পোকাটার পক্ষেও নীচের দিকে শরীরের পশ্চাদ্ভাগ আটকে সোজাসুজি উপরের দিকে ধাক্কা দিলেই বীজটাকে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করা সম্ভব নয়; তজ্জন্য অন্য কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন। ডিমের কথাই ধরা যাক। ডিমের অভ্যন্তরে একপ্রান্তে পাশাপাশিভাবে সংযুক্ত করা একটি রবারের ফিতার উপর ব্যাঙটা শরীর সঙ্কুচিত করে বসে সেখান থেকে ঊর্ধ্বদিকে লম্ফ প্রদান করলে ডিমের অবস্থা কি হবে? দেখা যাবে ব্যাঙের লম্ফ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই ডিমটা খানিক দূরে ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠল। এর কারণ এই যে, লাফাবার সময় নীচের দিকে যে চাপ পড়ে স্থিতিস্থাপকতা গুণে রবার তা সামলে নেয়; পরন্তু উপরের দিকে ধাক্কায় চাপের মাত্রা বেশী হবার ফলেই ডিমটা লাফিয়ে উঠে। মটরের অভ্যন্তরস্থ শুঁয়াপোকাও ঠিক এরূপ কৌশল অবলম্বন করে থাকে। মটরটা কাটলেই দেখা যায়—পোকাটা ফাঁপা স্থানটার চতুর্দিকে সূতা জড়িয়ে একটি আবরণ গড়ে তুলেছে। কর্তিত অংশের ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশের পথ বন্ধ করবার জন্য পোকাটা দ্রুতগতিতে সেই স্থলের আস্তরণটাকে আরও পুরু করে তোলে; একটু উত্তাপ প্রয়োগ করলে অথবা রৌদ্রে রাখলে খণ্ডিত বীজও লাফিয়ে দূরে চলে যায়। কর্তিত বীজ থেকে

পোকাটার কার্যকলাপ যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়—মটর-পোকা তার শরীরের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত ক্ষুদ্র সাঁড়াশীর মত যন্ত্রসাহায্যে আস্তরণের সূতা আঁকড়ে ধরে মস্তকের সাহায্যে উপরের দিকে বারম্বার ধাক্কা দিতে থাকে। প্রত্যেক-বার ধাক্কা দিবার সময়েই মুখ থেকে আঠার মত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা শুষ্ক হয়ে পুঞ্জীকৃত সূত্রে পরিণত হয়ে থাকে। এই পুঞ্জীকৃত সূত্রগুলির উপর ধাক্কা লাগার ফলে পোকাটার মাথায় আঘাত লাগে না, অধিকন্তু তা অনেকটা স্প্রিঙের মত কাজ করে, নীচের সূতার স্থিতিস্থাপকতা ও ঊর্ধ্বদিকে ধাক্কা এই উভয়ে মিলে মটরটাকে লাফিয়ে উঠতে সাহায্য করে। ধাক্কায় তারতম্যানুসারে মটরটা হয় গড়িয়ে যায়, নয় লাফিয়ে উঠে। মটরটা যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ছায়াযুক্ত স্থানে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত পোকাটা অনবরত ধাক্কা দিতে থাকে। যতদিন সূর্যের উত্তাপ প্রখর থাকে তত দিন শুঁয়াপোকার অবস্থায় কাটিয়ে মটর-পোকা পুত্তলির আকার ধারণ করে। পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে রূপান্তরিত হবার পর ফলের আবরণীর ভিতর থেকে যাতে সহজে বের হয়ে আসতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পুত্তলির আকৃতি পরিগ্রহ করবার পূর্বেই সে তার ধারালো চোয়ালের সাহায্যে খোলার গায়ে ছিদ্র করে ঢাকনা বন্ধ করে রাখে। পতঙ্গ সেই ঢাকনা ঠেলে বের হয়ে যায়।

লাফানো মটর ছাড়াও লাফানো-চাকৃতি নামে এক প্রকার সঞ্চরণক্ষম পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। এগুলি গাছের ফল না হলেও গাছের পাতা থেকে গঠিত ক্ষুদ্রাকার এক প্রকার চাকৃতির মত চ্যাপ্টা ও ফাঁপা পদার্থ, এই চাকৃতিগুলিও এক রকম পোকার বাসগৃহ। অতিরিক্ত উত্তাপ বা রৌদ্র থেকে আত্মরক্ষার জন্য এরাও লাফিয়ে বা গড়িয়ে গিয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে অবস্থান করে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে সাইকামোর নামে এক জাতীয় গাছ দেখতে পাওয়া যায়। এই গাছের পাতা থেকেই লাফানো চাকৃতি প্রস্তুত হয়ে থাকে। চাকৃতি প্রস্তুত করে, ফাইলোটোমা-য়্যাকেরিয়া নামে খুব ছোট্ট একরকম করাত-পোকা। এই পোকাগুলির শরীরের পশ্চাদ্ভাগে সূক্ষ্ম শুঁয়ার মত একজোড়া যন্ত্র থাকে। যন্ত্র দুটির শেষাংশ করাতের মত; এই যন্ত্র সাহায্যে এরা সাইকোমার পাতার প্রান্তভাগে শয়ানভাবে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। সাধারণত একটি পাতায় একটির বেশী ডিম পাড়ে না, কিন্তু সময় সময় এর ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। ডিম ফুটবার পর বাচ্চাটি পাতার উপর ও নীচের আচ্ছাদন চর্ম দুটি অক্ষুণ্ণ রেখে সবুজ কণিকাগুলি খেতে খেতে ক্রমশ ভিতরের দিকে অগ্রসর হয়। রোদ, বৃষ্টি ও অন্যান্য শত্রুদের ভয়ে বাচ্চারা কখনও পাতার পাতলা ভাঁজের ভিতর থেকে বাইরে আসে না। ৮।১০ দিন পর্যন্ত পাতার সবুজ কণিকাগুলি খাবার পর এদের পুত্তলি অবস্থায় রূপান্তরিত হবার সময় উপস্থিত হয়। এই সময়ে তারা পাতা থেকে নেমে এসে মাটির উপরেই অবস্থান করে। কিন্তু মাটির উপর অবস্থান করলেও নিজস্ব বাসগৃহের প্রয়োজন। বিশেষতঃ অনাবৃত শরীরে উপর থেকে নীচে নামতে পারে না। এই সমস্যা

সমাধানকল্পে তারা এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করে থাকে। পাতার অভ্যন্তরস্থ সবুজাংশ খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত যে স্থানে পৌঁছে সেখানেই পোকাটি তার শরীরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত সাঁড়াশীর মত ক্ষুদ্র যন্ত্র সাহায্যে একটি স্থান আঁকড়ে ধরে কিছুক্ষণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। পরে সেই কেন্দ্রস্থলে সংলগ্ন থেকেই চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে সুতীক্ষ্ণ চোয়ালের সাহায্যে পাতার উপরের দিকের পর্দাটাতে বৃত্তাকারে পর পর কতকগুলি ছিদ্র করে নেয়। ছিদ্র করবার কাজ সম্পূর্ণ হবার পর উপরে ও নীচে সূতা বুনে একটি আবরণ নির্মাণ করে। উপরের দিকের আস্তরণটি পাতলা এবং পাতার সঙ্গে সংযুক্ত; কিন্তু নীচের আবরণটি অপেক্ষাকৃত পুরু ও শক্ত হলেও পাতার পর্দার সঙ্গে সংলগ্ন নয়। আঠার মত পদার্থও সূত্র সাহায্যে নির্মিত চাকৃতির নীচের দিকে আস্তরণটি স্প্রিঙের মতই নমনীয়। পোকারা এই নমনীয় আস্তরণটি ছিদ্রবেষ্টিত উপরের পর্দার গোলাকার অংশের সঙ্গে নিখুঁতভাবে মুড়ে দেয়। এই গোলাকার অথচ চ্যাপ্টা কুঠরির মধ্যেই পোকাটাকে মাটির উপর কিছুকাল বাস করতে হবে। কিন্তু বাসাটা তখনও পাতার সঙ্গেই সংযুক্ত, মাটিতে নেমে আসবে কেমন করে? পূর্বেই বলেছি আস্তরণ নির্মাণ করবার পূর্বেই পোকাটা কেন্দ্রস্থলের চতুর্দিকে মুখ ঘুরিয়ে বৃত্তাকারে কতকগুলি সূক্ষ্ম ছিদ্র করে রেখে দেয়। আস্তরণ নির্মাণ শেষ হবার পর নীচের মেঝের সূতা কামড়ে ধরে পোকাটা শরীরের পশ্চাদ্দেশের সাহায্যে বারংবার উপরের পর্দার ছিদ্রযুক্ত অংশে আঘাত করতে থাকে। একটু দূর থেকে এই আঘাতের খুট খুট শব্দ কানে শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এরূপ আঘাত দিবার পর গোলাকার কর্তিত অংশটা পাতা থেকে আলগা হয়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। বিচ্ছিন্ন চাকৃতিটার উপরে থাকে পাতার অংশ ও নীচের দিকে থাকে জমাট সূতার আবরণ। পূর্বেই বলেছি, এরা রৌদ্র ও উত্তাপ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে লাফিয়ে বা গড়িয়ে ছায়াযুক্ত স্থানে চলে যায়। কিন্তু মটর ও চাকৃতির লম্ফ প্রদানের কৌশলের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। মটরের পোকা মস্তকের ধাক্কায় বীজটাকে উপরে ঠেলে দেয়। চাকৃতির পোকা পাতার দিকটায় সূতা কামড়ে ধরে শরীরের পশ্চাদ্দেশের সূক্ষ্ম সাঁড়াশীর সাহায্যে নীচের নমনীয় আবরণটাকে ভিতরের দিকে টেনে নিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দেয়। এর ফলে আস্তরণটা স্প্রিঙের মত ব্যবহার করে এবং সেই ধাক্কার ফলেই চাকৃতিখানি ঊর্ধ্বে লাফিয়ে উঠে। টানের তারতম্যানুসারে চাকৃতিখানি এপাশে-ওপাশে গড়িয়ে যায় কিম্বা দূরে ছিটকে পড়ে।

(প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮)

———

লজ্জাবতীর সাড়া

লজ্জাবতী লতা আমাদের দেশের সর্বত্রই পরিচিত। এই উদ্ভিদের পাতাগুলি এতই স্পর্শকাতর যে, সামান্য একটু স্পর্শ বা আঘাতে পাতার লম্বা ডাঁটাটা নীচের দিকে নুইয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই পাতাগুলি সম্পূর্ণরূপে মুড়ে যায়। কিন্তু আঘাত-জনিত উত্তেজনা কেমন করে দূরবর্তী স্থানে অত দ্রুতগতিতে সঞ্চালিত হয়ে বোঁটার (Pulvinus) পতন ও পত্রপুঞ্জের সঙ্কোচন ঘটায়, কেমন করে লজ্জাবতী সাড়া দেয় প্রত্যেকেরই সে কথা জানবার কৌতূহল অদম্য। আচার্য জগদীশচন্দ্র লজ্জাবতী লতার এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বিভিন্ন উপায়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকার্য পরিচালনা করেছিলেন। কোন কারণে উত্তেজিত হলেই লজ্জাবতীর বোঁটার স্ফীত স্থানগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নীচের দিকে বেঁকে যায়, ফলে পাতার ডাঁটাটি নুইয়ে পড়ে এবং পরক্ষণেই পাতাগুলি মুড়ে যায়। পরীক্ষার ফলে বুঝা গেল বোঁটার নীচের দিকে কতকগুলি বিশেষ ধরনের কোষ রয়েছে। বোঁটার পাতলা সেকশান কেটে সেগুলিকে হিমাটক্সিলিন ও স্যাফ্রানিক নামক রঞ্জক পদার্থে ডুবিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখা গেল, বোঁটার ঐ বিশেষ কোষগুলি লাল রঙে রঞ্জিত হয়েছে। কিন্তু 'কর্টেক্সের' কোষগুলি কোন রঙই গ্রহণ করে নি। এগুলিকেই তিনি সক্রিয় পদার্থ বা Active bodies বলেছেন। সামান্য কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হলেই এই পদার্থগুলি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে এবং তার ফলেই পাতার পতন ঘটে। শারীরতাত্ত্বিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হলো যে, প্রাণিদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন এক খণ্ড মাংসপেশী সংলগ্ন স্নায়ুসূত্রের দূরবর্তী প্রান্তে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করলে সেই উত্তেজনার প্রবাহ যেমন স্নায়ুসূত্রের সাহায্যে পরিচালিত হয়ে মাংসপেশীতে সাড়া জাগায়, লজ্জাবতী লতার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই পত্রসংলগ্ন বিচ্ছিন্ন কাণ্ডের দূরবর্তী স্থানে উৎপন্ন উত্তেজনাপ্রবাহ বিশেষ কোষশ্রেণীর সাহায্যে সঞ্চালিত হয়ে পাতার বোঁটা অর্থাৎ পালভাইনাসে উপনীত হলেই পাতা মুড়ে সাড়া দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, প্রাণিদেহে যেমন বিষাক্ত পদার্থ অবসাদক বা শৈত্য প্রয়োগে উত্তেজনা প্রবাহ বন্ধ করা যায়, স্পর্শকাতর উদ্ভিদের ক্ষেত্রেও তেমনি ক্লোরোফর্ম, ইথার, বিষ ও শৈত্য প্রয়োগে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে উত্তেজনায় সাড়া দেবার পদ্ধতির এরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই জগদীশচন্দ্র এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, প্রাণিদেহের মতো অঙ্গ সঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদদেহেও উত্তেজনাপ্রবাহ পরিচালিত হয়ে সাড়া দেবার ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে তোলে।

কিন্তু রিকা (১৯১৬) এবং পরবর্তী অপর কয়েকজন গবেষক প্রকাশ

করেন যে, Mimosa Pudica-নামক লজ্জাবতী লতার ডাঁটা, কাণ্ড প্রভৃতি থেঁতো করে রস নিংড়ে নিয়ে লজ্জাবতী লতার কর্তিত স্থানে প্রয়োগ করলে যথারীতি পাতা মুড়ে সাড়া দেয়। তা ছাড়া গাছ লজ্জাবতীর (Tree mimosa বা Mimosa spegazzinni) পাতা সমেত অগ্রভাগের খানিকটা কেটে নিয়ে জলপূর্ণ সরু কাচনলের সাহায্যে পুনরায় কর্তিত স্থানে মুড়ে দিলে কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তখন কর্তিত স্থানের নীচের অংশটাতে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ছেঁকা দিলে অনেক ক্ষেত্রেই উপরের অংশের পাতাগুলিকে মুড়ে যেতে দেখা যায়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আহত স্থানে নির্গত এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ রসস্রোতে পরিবাহিত হয়ে পাতার পালভাইনাস অর্থাৎ বোঁটার উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং তার ফলেই পাতা মুড়ে সাড়া দিয়ে থাকে। কাজেই দেখা যায়, লজ্জাবতী সাড়া দেবার ব্যাপারে জগদীশচন্দ্র যেখানে উত্তেজনাপ্রবাহ পরিচলনের কথা বলেছেন, রিকা প্রমুখ গবেষকরা কিন্তু উত্তেজক পদার্থের পরিবহণকেই এজন্য দায়ী করেছেন।

যা হোক, রিকার পরীক্ষায় গাছ লজ্জাবতীত উত্তেজক পদার্থের অস্তিত্বের বিষয় আবিষ্কৃত হবার পর স্নো (১৯২৪-২৫) সাধারণ লজ্জাবতী লতার (Mimosa Pudica) অনুরূপ উত্তেজক পদার্থের সন্ধান পান। এই ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে ক্রমশ আরও অনেক গবেষণা-কর্মী এই পদার্থটির পৃথকীকরণ এবং রাসায়নিক গঠন নির্ধারণের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। মোলিস (১৯২১) বলেন, পদার্থটি ফেনোলিক ধর্মীয়, এবং সাধারণ লজ্জাবতীর (Mimosa Pudica) অঙ্গসঞ্চালন ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই, যেহেতু অঙ্গসঞ্চালনক্ষম উদ্ভিদ গাছ লজ্জাবতী থেকে এরূপ কোন পদার্থ নির্গত হতে দেখা যায় না। কিন্তু জেনী রেন্জ (১৯৩৬) একরকম নতুন পদার্থের সন্ধান পান এবং পদার্থটির নাম দেন Mimosin। ফিটিং, নিয়েনবার্গ, ট্যানবক (১৯৩৭) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা জেনী রেনজকে সমর্থন করেন। কিন্তু আমাদের গবেষণাগারে লজ্জাবতীলতার কর্তিতাংশ মূল উদ্ভিদের সঙ্গে পুনঃসংযোজনের পর একদিকে মাইমোসিন প্রয়োগ করে কোন সাড়াই পাওয়া যায় নি। এর পর আরও অনেক গবেষণাকর্মী লজ্জাবতীর রস থেকে সক্রিয় পদার্থ পৃথকীকরণ এবং তার রাসায়নিক গঠন নিরূপণের জন্য কাজ চালিয়ে গেছেন ; কিন্তু এ স্থলে সেসব বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নয়। তবে এই সম্বন্ধে বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত কতকগুলি পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। কয়েকটি পরীক্ষায় কৌতূহল উদ্রেকের ফলে ঐ সময়ে লজ্জাবতী লতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হয়েছিলাম। প্রথমেই রিকা এবং স্নো কর্তৃক অনুষ্ঠিত পরীক্ষার অনুরূপ লজ্জাবতী লতার কর্তিতাংশে জলপূর্ণ সূক্ষ্ম কাচনলের সাহায্যে পুনঃসংযোজিত করে তার এক দিকে জ্বলন্ত কাঠির সাহায্যে আঘাত দিয়ে দেখা গেল, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে ঈষৎ

সাড়া দেবার মতন লক্ষণ দেখিয়েছে। কিন্তু তাতে সময় লেগেছিল ৪০ মিনিট থেকে ২ ঘণ্টারও উপর। একে ঠিক সাড়া দেওয়া বলা যায় না।

লজ্জাবতী লতার ওপর দিকের কর্তিতাংশ ক্ল্যাম্পের উপর বসিয়ে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আনবার পর লজ্জাবতীর বোঁটা ও ডাঁটার কর্তিত স্থান থেকে নির্গত রস নিয়ে ক্ল্যাম্পে বসান কাণ্ডের কর্তিত স্থানে প্রয়োগ করেও কোন সাড়া পাওয়া যায় নি।

পৃথক টবে বসান দুটি পৃথক লতার ডগার দিক কেটে দুটির কর্তিত স্থানে পরস্পরের উপর চেপে জুড়ে দেওয়া হল। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবার পর জ্বলন্ত কাঠির ছেঁকা দেওয়া সত্ত্বেও অপর অংশের সাড়া দেবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি।

দুটি কাণ্ডের কর্তিত স্থান দুটি পরস্পরের কাছাকাছি এনে (কয়েক মিলিমিটার দূরত্বে) এক ফোঁটা জল দিয়ে সংযোগ করে দেখা গেছে, তাতেও এক দিকে উত্তেজনার সৃষ্টি করলে অপরদিকে তা পরিচালিত হয় না।

বোঁটা সমেত লজ্জাবতীর দুটি পাতা কেটে নিয়ে জলপূর্ণ সরু একটি U-টিউবের দুই দিকে বসিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবার পর একদিকের পাতায় উত্তাপ প্রয়োগ করতেই পাতাগুলি মুড়ে গিয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু অপর পাতাটির মধ্যে কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না।

এর পর লজ্জাবতীর পাতা, ডাঁটা ও কাণ্ড থেঁতো করে সংগৃহীত রস কাণ্ডের কর্তিত স্থান এবং বোঁটায় প্রয়োগ করে দেখা গেল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাতা সঙ্কুচিত হয়ে সাড়া দেয়।

কিন্তু কচি আমপাতা, জামরুল ও জামপাতা প্রভৃতির রস প্রয়োগ করবার ফলেও লজ্জাবতীর পাতাগুলি পরিষ্কারভাবে সাড়া দিয়ে থাকে।

লজ্জাবতীর ডাঁটা ও পাতা থেঁতো করে রস থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সর্বশেষ যে-পদার্থ পাওয়া গেল, লজ্জাবতীর সাড়া জাগাতে তাকে খুবই সক্রিয় মনে হল। কর্তিত স্থানে সামান্য একটু রস প্রয়োগ করলেই লজ্জাবতী সঙ্গে সঙ্গে পাতা মুড়ে সাড়া দেয়। জল মিশিয়ে হাল্কা করে প্রয়োগ করলেও সাড়া দেবার ব্যাপারে তার কোন তারতম্য দেখা যায় না। ক্রমশ জল মিশিয়ে ডাইলিউসনের মাত্রা অসম্ভব রূপে বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল তাতে সাড়া জাগাবার ক্ষমতা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। ভেবে-চিন্তে কোনই হদিস পাওয়া গেল না। অবশেষে মনে হল, অত উঁচু ডাইলিউসনের সক্রিয় পদার্থের পরিবর্তে শুধুমাত্র পরিস্রুত জল প্রয়োগ করতেই, পাতাগুলি মুড়ে গিয়ে সাড়া দিল। অসংখ্যবার পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি, প্রায় ৯০ ভাগ ক্ষেত্রেই জল প্রয়োগে লজ্জাবতী অভ্রান্ত ভাবে সাড়া দিয়ে থাকে। এর পরে লজ্জাবতী লতার সাড়া দেবার রহস্য উদ্ঘাটনে হয়তো নতুন করে ভাবতে হবে।